Shri Amarnath Yatra — Experience of a lifetime

Mrityunjoy (*Pappu*) Saha

Shri Amarnath yatra attracts hundreds of thousands of pilgrims from around the world who visit the holy cave of Lord Shiva each year. The cave is surrounded by snowy mountains, situated at an altitude of 12,756 feet or 3,888 metres above sea level, about 141 kilometres or 88 miles from Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir in India. The yatra happens in the summer months depending on the weather conditions.

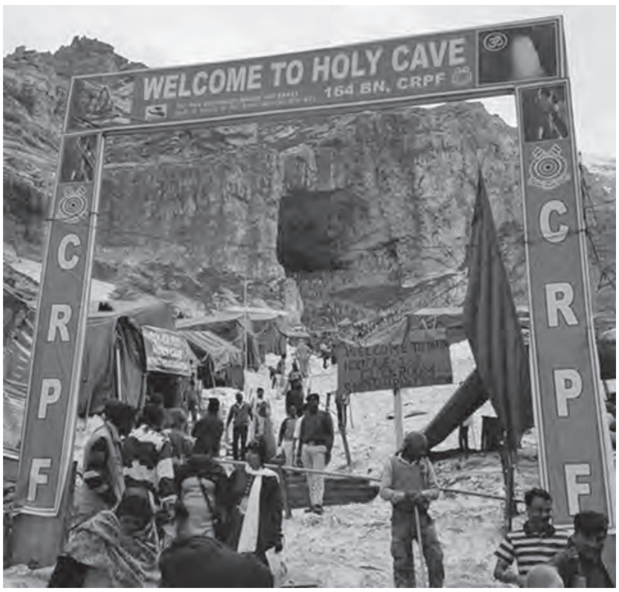

The name Amarnath, also called "Barfani Baba", consists of two segments; 'Amar' meaning immortal and 'Nath' meaning the Lord. The Amarnath shrine is considered to be one of the holiest shrines in Hinduism and has significant implication in Hindu mythology. The Shrine is managed by Shri Amarnathji Shrine Board, who works closely with local and central Governments of India to ensure proper performance of worship at the Holy Shrine.

The Myth:

It is believed, once Mother Parvati inquired to Lord Shiva about his immortality; why Lord himself was free from the cycle of birth and death while she had to take birth again and again. Lord Shiva agreed to narrate the immortal story, called Amar Katha, to Mother Parvati, also wanted to ensure the secrecy of Amar Katha as it was not to be revealed to anyone other than Mother Parvati. For this purpose, Lord Shiva looked for an isolated place and his search led him to the Amarnath cave. Lord Shiva made sure to burn everything around the cave to ensure no living creature could hear him telling the secret story to Mother Parvati. On the way, Lord Shiva gave up all his belongings; his companion, Nandi was left at Pahalgam, his son Ganesh at the Mahaguna mountain, the moon at Chandanwari, all his snakes at the banks of Lake Sheshnag. In the cave, Lord Shiva narrated the story to Mother Parvati. However, there was an egg of a pigeon hiding under the deer-skin mat of Lord Shiva which was a witness to the event and later two pigeons were hatched from the egg. It has been believed that both pigeons became immortal and often spotted during Amarnath Yatra by pilgrims.

Inside the 130 feet high cave, an ice lingam (stalagmite) forms due to freezing of water drops that fall from the roof of the cave on to the floor and grows up vertically from the cave floor. The lingam reaches to a maximum height in around July-August when the ice caps around the cave are melting. As per the religious beliefs, it has been claimed that the lingam grows and shrinks with the phases of the moon reaching its height during the summer festival.

Yatra Routes:

Traditional route via Pahalgam is longer but preferred by most pilgrims due to the gradual slopes. In the old days the pilgrimage started at Srinagar, but these days most pilgrims start at Chandanwari which is 16km from Pahalgam. Pilgrims can cover the distance toward the holy cave and back via Pissu Top, Sheshnag, Panchtarni in 5 days.

The shorter but steeper route via Baltal, Domial, Barari and Sangam from Sonamarg is 15 km long and allows pilgrims to cover the distance in 1-2 days. This route is considered more favourable for returning back from the holy cave than on the way up as the steep slope is said to cause serious health problems among un-acclimatised visitors.

Both the routes are well-equipped with facilities and security, mostly provided by the Indian Army, Government agencies, non-profit organizations and private companies.

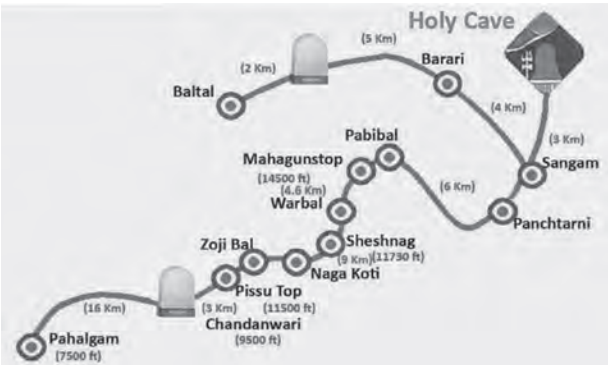

Yatra Requirements:

A yatra permit with prior registration is required for all pilgrims. A valid Compulsory Health Certificate (CHC) for each individual, duly issued by authorised doctors/institutions, is also required. The registration form and the list of authorized doctors/ institutions are made available on the Shrine Board's website well ahead of the yatra period. Pilgrim, intending to avail helicopter services for the yatra, is required to provide valid CHC while boarding the helicopter.

Children below 13 years, elderly aged above 75 years and ladies more than 6 weeks pregnant are not allowed to undertake the pilgrimage.

Tips & Suggestions:

1. Early registration for yatra is recommended in addition to early purchase of the helicopter tickets to ensure yatra on desired date. It is recommended to have at least one reserve day in the yatra to accommodate any unforeseen event
2. Amarnath yatra is not recommended to people who are not physically fit. Several months of physical and mental preparation is needed to avoid high-altitude, respiratory and mountain sickness. Senior citizens should avail ponies or palkis in addition to helicopters
3. Weather is very unpredictable in the mountains. Appropriate clothing is necessary. Waterproof hiking boots as well as bags are recommended for better protection. It is recommended to purchase enough health insurance prior to the yatra
4. Telecommunication facilities are very limited. Only roaming enabled post-paid and locally purchased pre-paid phone lines of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) work in some areas
5. Cash money is needed for miscellaneous expenses throughout the yatra. One should carry enough cash in Indian Rupees
6. Nearest airport is in Srinagar which requires additional time for security checks. Closest train station is Jammu Tawi which is well connected to all major cities. Advance purchase of train tickets is highly recommended. National highway that connects the Kashmir valley is NH-1A. Travelling through highway may require additional time due to traffic jams. ❑

References & useful website links:

1. Shri Amarnathji Shrine Board website: http://www.shriamarnathjishrine.com/
2. Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Amarnath_Temple
3. Blog: https://www.makemytrip.com/blog/amarnath-yatra-the-journey-of-a-lifetime
4. Photo Gallery: https://flic.kr/s/aHsmHigmFL

লালন ফকির

স্মৃতিকণা কর

"আছে যার মনের মানুষ মনে,
সে কি জপে মালা?
অতি নির্জনে বসে বসে দেখেছে খেলা।"

– মুক্ত মানবতাবোধের বিকাশ ছিল লালনের সাধনা। কুসংস্কার মুক্তি আর জাতিভেদের উর্ধ্বে ওঠাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। তার ব্যক্তিজীবন ছিল আত্মমগ্নতার এবং আত্ম আবরণের গভীরে অবস্থিত। সাধারণ মানুষ হয়েও অসাধারণ দার্শনিক হওয়ার প্রতীক হিসেবে আমাদের বোধের ঘরে নিত্য আনাগোনা এই লালনের।

বড় অদ্ভুত এক কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার মধ্যে বিচরিত তার জীবন কাহিনী। ১১৬ বছরের বিশাল পরিসরে তার বিচরণ মানবজাতিকে মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে।

শোনা যায় অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালির গড়াই নদীর ধারে অবস্থিত চাপড়াভাড়ার গ্রামে লালন জন্ম নেন ১৭৭২ সালের ১৭ই অক্টোবর (১লা কার্তিক ১১৭৯)। অন্যমতে ১৭৭৪ এ তাঁর জন্ম। তার বাবার নাম মাধব, মা পদ্মাবতী। জন্মসূত্রে লালন ছিলেন কায়স্থ। পারিবারিক পদবী ছিল কর। কেউ কেউ বলেন কর রায়। শৈশবে পিতৃহীন লালন পড়াশুনা করার সুযোগ পাননি। তৎকালিন সংস্কৃতি, গান ও নানারকম গ্রাম্য লৌকিক উৎসবে মন পড়ে থাকতো লালনের। ভেতরে ভেতরে তার অন্তরাত্মা জারিত হতে থাকে কীর্তন, কবিগানের জারক রসে। বাবার অকাল মৃত্যু তাকে সংসারী হতে বাধ্য করে। গ্রামের শেষ সীমানায় স্ত্রী ও মাকে নিয়ে সংসার পাতেন। কিন্তু নিয়তির টানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। এক মুসলমান মহিলা তাকে উদ্ধার করে পরম যত্নে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। সুস্থ হয়েও বসন্তে এক চোখ হারিয়ে লালন তার গ্রামে ফিরে এসে পেলেন প্রবল এক অনভিপ্রেত আঘাত। তার মা, স্ত্রী কেউই তাকে গ্রহণ করতে পারলেন না তৎকালিন সমাজপতিদের বিধানে। তার শ্রাদ্ধ করা হয়েছিল। এই সামাজিক নির্বাসন লালনের বুকে বাজলো নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিকভাবে। সামাজিক বিধান, সংসারধর্ম, সমাজ-সংস্কার সমস্ত কিছুই তার কাছে ধোঁয়াশা তৈরি করলো। তার মন থেকে দুরিত হল আজন্ম লালিত বোধ-বিশ্বাস। ঘর ছাড়ার আগে লালন তার মা-কে বলে গেলেন, যে সমাজ মানুষ চেনে না, চেনে শাস্ত্র, ধর্ম মানে না, মানে গোঁড়ামি, সে সমাজ উচ্ছন্নে যাক মা, সে সমাজ দিয়ে আমার কোন কাজ নেই।

ঘর ছাড়ার আগে লালন তার মা-কে বলে গেলেন, যে সমাজ মানুষ চেনে না, চেনে শাস্ত্র, ধর্ম মানে না, মানে গোঁড়ামি, সে সমাজ উচ্ছন্নে যাক মা, সে সমাজ দিয়ে আমার কোন কাজ নেই।

তারপর সিরাজ শাহ নামে এক মারফতি ফকিরের কাছে গিয়ে লালন আশ্রয় নিলেন এবং সিরাজের নিজ হাতে পরানো 'খেরকা' নিয়ে হলেন খেরাধাকী ফকির। লালন হিন্দু নাম এবং শাহ্ মুসলমান জাতীয় উপাধি। সমস্ত মানুষকে তিনি সমানভাবে দেখতেন। কেউ তার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে গুনগুন করে গেয়ে উঠতেন, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।' তাই হয়তো বিশ্বচরাচরই তার ঘর। সঙ্গীতই তার সংসার– স্ত্রী, পুত্র আর মানবতাই তার মূল ধর্ম। লালন ফকির ছিলেন জাতপাতের উর্ধ্বে। আত্মানুসন্ধান ও জীবনদর্শন বোধে আছে বাউল মানুষের রক্তের সম্পর্ক, নাড়ির টান। এখানে নারী ও পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। এখানে সবাই মানুষ। লালনের এই জীবনদর্শন উদাসী পরিক্রমা আর আত্মানুসন্ধান আমরা তাঁর গানে পাই–

'তোমায় হৃদমাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না।'

'ক্ষমা অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।'

(রবীন্দ্রনাথের– 'আমার মাথা নত করে দাও হে')

লালনের মুখে যে গানই শোনা যেত, তা সে 'আল্লাহ্ রসূলই হোক কিংবা যেকোন ঠাকুর দেবতাই হোক, সে তো জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা। যতদিন মিলন না হয় ততদিন তো তাকেই বলা হয় বিরহ। লালনের বুকের পাঁজর দিয়ে তৈরি হয়েছিল বাংলার গ্রামের লোকায়ত ধর্মের গানের ঝাঁপি। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বিশ্ব বাউলের সংসার। বাউল সাম্রাজ্যের রাজা তিনি। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি মনন বিদ্যার দ্বারা সাধন মার্গে পৌঁছান। তার সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে প্রেমের দ্বারা। এই কারণে 'বাউল' বলে আখ্যায়িতরা প্রেম ব্যাকুলতায় উন্মত্ত। নিজেদের 'পাগল' বলে পরিচয় দিতেই তারা আগ্রহী। আজও বাউল গানগুলোর রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে লালন শাহ্ ফকিরের নাম উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। ১৮৯০ সালে ১৭ই অক্টোবর (১লা কার্তিক, ১২৯৭) শুক্রবার ভোরে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

গান–

এক পরশী বসত করে
মিলন হবে কতদিনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর গানগুলি রচিত হয়। আর এক বরেণ্য গীতিকার ও সুরকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্মৃতি' পাতায় লিখেছেন যে, 'একদিন বোলপুরের রাস্তায় একটি বাউল গান শুনিয়েছিলেন– "খাঁচার ভিতর অচীন পাখি..." লালন ফকির এটির রচয়িতা কবি তা জানতেন। 'গোরা' উপন্যাসের সূচনাতে এই গানটিকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন। এই গানটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচীন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়। মন তাহাকে চিরন্তন ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না।' এই অচীন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে (খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে)।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউল গানের একটি উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধ আছে। তার জ্যোতিদাদা শিলাইদহে লালন ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর একটি ছবিও এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি বাউল গান সংগ্রহ করেন। বাউল গানের সুর তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। অনেকেই লালনকে আলাদা করে 'বাউল' না বলে 'সুফি' বলার পক্ষপাতি। কিন্তু লালন 'সুফি' হিসেবে আত্মপরিচয় দেননি। তিনি লৌকিক সাধক ছিলেন। 'বাক্', 'বায়ু', আর 'বস্তু' এই তিন 'ব'-এর সাধকেরা হলো বাউল।

অনেক গবেষক 'বাউল' বলতে বুঝিয়েছেন হিন্দু সমাজভুক্ত সাধক বা গায়কদের। 'ফকির' বলতে বুঝিয়েছেন মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক-গায়কদের। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের সীমা লঙ্ঘন করে বন্দনা করেছেন বাউলদের। বিশেষ করে লালনের গানকে তিনি বাউল গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লালন ফকিরের অনুগামী বলে পরিচিত গগন হরকরা রচিত 'আমি কোথায় পাব তারে' –এই গানটি শিলাইদহ অঞ্চলের কোনো বাউলের কণ্ঠে কবি কলকাতাতে বসেই শুনে 'হারামনি' পত্রিকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে– "কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটাই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে।

'তং বেদং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুং পরিব্যাথাঃ।'

– যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটাই শুনলাম তার গ্রাম্য সুরে সহজ ভাষায়। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।" এই গান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন– এই জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েই একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই মিলনে গান জেগেছে, এই গানের ভাষা ও সুর এক অনন্য মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরআন-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই অপূর্ব মিলনেই ভারতের সভ্যতার অন্যতম পরিচয় লুকিয়ে আছে। লালনের অপূর্ব সুর। সমন্বিত বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। ❑

ছোটদের পূজা ভাবনা

Durga Puja

Who is Ma Durga? Ma Durga is a Hindu goddess who has 10 hands. In each hand she has a weapon. Each of the weapons represent a symbol. Durga puja celebrates the victory by defeating Mahishasur. Ma Durgas children are Kartikeya, Ganesha, Saraswati, and last but not least Lakshmi. Ma Durgas husband is Shiva. Apart from Durga there are about 33 Million other gods that hindus worship. Many statues of Durga exist, Some made thousands of years ago. She is often portrayed fighting Mahishasur. The Sanskrit word durga means fort or a place that is protected and thus difficult to reach. The days of Durga puja are Shasthi, Saptami, Ashtami, Navami, and Dashami. At Durga puja people wear cultural clothes such as saries a Panjabees. In Durga puja people eat vegetables and Kichori.

– Samantha Purkayastha
– Age: 10
– Grade: 5

চলমান পাথরের রহস্য

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্যে ভরা এই বিশ্বের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক রহস্য। তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস বিস্ময়ের বস্তু হিসেবেই থেকে যায় অনেকটা সময় জুড়ে। ঠিক যেমন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের 'ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক'-এর চলমান পাথরগুলো।

বিস্ময়কর 'রেসট্র্যাক প্লেয়া'

উপত্যকার চারিদিকে ধু-ধু করছে শূন্যতা। শুধু খটখটে শক্ত মাটির উপর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় নানা মাপের অনেক পাথর। কিন্তু প্রত্যেকটা পাথরের পিছনেই একটা রাস্তার মতো তৈরি হয়ে গিয়েছে (যেমন হাই স্পিড কার রেসিং ট্র্যাকে জোরে গাড়ি চলার ফলে হয়ে যায়)। এই কারণেই জায়গাটির নাম দেওয়া হয় রেসট্র্যাক প্লেয়া। দেখে মনে হবে যেন পাথরগুলো জায়গা থেকে সরে যাওয়ার কারণে শক্ত মাটির উপর পাথরের নিচের অংশ ঘষা লেগে ওই 'ট্র্যাক'গুলো তৈরি হয়েছে। কয়েকটা পাথরের ট্র্যাক সমান্তরালভাবে এসেছে, আবার অনেক পাথরের ট্র্যাক একে অপরকে আড়াআড়িভাবে কেটে চলে গিয়েছে। কিন্তু চিরন্তন সত্য এটাই যে পাথর জড় বস্তু। তা নিজে থেকে সরতে পারে বললে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হবে। আবার কোনো পশু বা মানুষ সকলের আড়ালে বসে এই পাথরগুলো সরিয়ে দিচ্ছে, সেই অজুহাতও ধোপে টেকে না। পাশাপাশি বড় কোনো ঝড় বা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এর জন্য দায়ী বলেও কোনো প্রমাণ মেলেনি। এই চলমান পাথরের সঙ্গে এলিয়েনদের কোনো যোগাযোগ রয়েছে, এক সময় এমনটা ভাবা হলেও, তা প্রমাণ করা যায়নি।

রেসট্র্যাক প্লেয়ার চলমান পাথর

রহস্য অনুসন্ধানের পথে...

১৯৪৮ সালে এই নিয়ে প্রথম রিপোর্ট তৈরি হয়। তবে পাথরগুলো কীভাবে স্থান পরিবর্তন করে তা তখনও কারো নজরে আসেনি। তারপর ২০১১ সালে এই রহস্যের উন্মোচন করতে মাঠে নামেন একদল বিজ্ঞানী। প্রথমে রেসট্র্যাক প্লেয়ার পাশে তাঁরা একটা ওয়েদার স্টেশন নির্মাণ করে সেখানকার পাথরগুলোর সঙ্গে নিজেদের ১৫টি পাথর রেখে দেন। এগুলোর মধ্যে ফুটো করে 'জি পি এস ট্র্যাকার' বসিয়ে দেয়া হয়। প্রথম ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ এবং ২০ তারিখে সেই 'টাইম ল্যাপস্ ক্যামেরা'য় ধরা পড়ে চাঞ্চল্যকর ছবি! দেখা যায়, পাথরগুলো মিনিটে প্রায় তিন থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করছে। একটি পাথরকে ২২৪ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করতেও দেখা যায়। এরপর ওই বিজ্ঞানীদের দলের দুই অনুসন্ধানকারী রিচার্ড ডি নরিস এবং তাঁর ভাগ্নে জেমস্ নরিস দাবি করেন যে, তাঁরা এই চলমান পাথরের পিছনের রহস্যটি উন্মোচন করে ফেলেছেন!

আসল সত্য কী?

জায়গাটিকে রেসট্র্যাক কেন বলে তা আগেই বলেছি। কিন্তু রেসট্র্যাক প্লেয়া-এর বাকি রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে প্লেয়া কথাটির মধ্যে। প্লেয়া মানে হচ্ছে খটখটে মাটি, যেখানে আগে হয়তো হ্রদ বা জলাশয় ছিল। অনুসন্ধানে উঠে আসে যে, রাতে যদি এই এলাকায় বৃষ্টি হয়, তাহলে এই গোটা উপত্যকাটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু জমা জলের গভীরতা দুই থেকে তিন ইঞ্চির বেশি হয় না। তখন তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা নেমে যায়, তাহলে এই জমা জলের উপরে বরফের আস্তরণ পড়ে যায় এবং এর মধ্যেই আটকে পড়ে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলো (যদিও এই রকম আবহাওয়া ও অনুকূল পরিস্থিতির সংযোগ খুব বেশি হলে তিন বছরে একবারই হয়)। তারপর যখন সূর্যের আলো ফোটে ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন বরফের আস্তরণ পাতলা হয়ে ভেঙে যায় এবং বরফের চাকের মধ্যে আটকে থাকা পাথরগুলো হালকা হওয়ার ধাক্কায় ভেজা মাটির উপর পিছলে যেতে থাকে। মোটের উপর এই হল পাথরগুলোর চলমান হয়ে ওঠার আসল রহস্য। প্রায় ৩০০ কেজি ওজনের পাথরগুলো যখন ভেজা মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন ঐ রেসট্র্যাকের মতো দাগগুলো সৃষ্টি হয়। সকালে তাপমাত্রা বাড়তেই সব জল শুকিয়ে পুরো উপত্যকাটি আবার খটখটে হয়ে গেলেও, পাথরগুলো অতিক্রম করে আসা পথের দাগগুলো থেকেই যায়। যা কি না সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এই ডোলোমাইট বা সাইনাটের ভারী পাথরগুলো কতটা পথ অতিক্রম করেছে। আর এটাই হল এই বিস্ময়ের পিছনের মূল বিজ্ঞান। ❑

জায়গাটিকে রেসট্র্যাক কেন বলে তা আগেই বলেছি। কিন্তু রেসট্র্যাক প্লেয়ার বাকি রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে প্লেয়া কথাটির মধ্যে। প্লেয়া মানে হচ্ছে খটখটে মাটি, যেখানে আগে হয়তো হ্রদ বা জলাশয় ছিল।

পদাবলী কীর্তন-কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন

শ্রীবুলবুল ভৌমিক

ভূমিকা: পদাবলী কীর্তন শ্রবণে ভাবরসে নিমজ্জিত হয় না এমন বাঙালির সংখ্যা নগণ্য বলতে হবে। যদিও এ অমূল্য নিধি সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু) বাঙালির একান্তই নিজস্ব সম্পদ তবুও ধর্মের ঊর্ধ্বে উত্তরণ ঘটেছে এর ভাব, ভাষা ও সুরের -সর্বোপরি এর গ্রহণযোগ্যতার। এক কথায় বলা যায়, পদাবলী কীর্তন সকল বাঙালির প্রাণের টান, অন্তরের গান। পদাবলী কীর্তন বাঙালির শুধুমাত্র এক অভিনব সৃষ্টিই নয়, তা বাঙালির এক আধ্যাত্মিক অবদানও বটে। পদাবলী কীর্তন একইসাথে সঙ্গীতসাধনা এবং ধর্মসাধনা- মর্ত্য ও অমৃতের মিশ্রণ।

উৎসের সন্ধানে : আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমনের পরবর্তীতে এই পদাবলী কীর্তন এক বিশেষ ধারা ও আকার প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এর বীজ উপ্ত হয়েছিল অনেক পূর্বে- **শ্রীমদ্ভাগবতে**। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাদের সর্বত্যাগী কিন্তু শুধুমাত্র কৃষ্ণাশ্রয়ী প্রেম (**"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"** শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১৮/৬৬। অর্থাৎ সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ কর) তা অতি সুচারুভাবে চিত্রিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে- বিশেষত একুশ থেকে তেত্রিশ অধ্যায়ে। আর ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকা (যদিও নাম উহ্য) যেমন প্রেমে শ্রেষ্ঠা তেমনি বিরহেও অতুলনীয়া। আর শ্রীমতি রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক টান বা ভালোবাসা এবং বিরহই পদাবলী কীর্তনের মূল উপজীব্য বিষয়। প্রেম বা বিরহের একটা যদি পুরোনো হয়ে যায় তবে অন্যটাও হয়ে যায় প্রাণহীন। তাই রাধা-কৃষ্ণের চিরনবীন প্রেম-বিরহ ভিত্তিক এই পদাবলী কীর্তন কখনোই পুরাতন হয় না রসজ্ঞ শ্রোতার কাছে। আরও উল্লেখ্য যে, কীর্তনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতেই। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ যে নববিধা ভক্তির উল্লেখ করেন তার মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে কীর্তন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/২৩) (অন্যান্য আট প্রকার ভেদ হচ্ছে শ্রবণ, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন)।

আরও এক প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক অনেক কাব্য, নাটক, স্তোত্র রচিত হয়েছে- প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়। শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ বা অবলম্বন করে পদকর্তাগণ "আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে" তাঁদের নিজস্ব ধারায় অনেক অবিস্মরণীয় পদ উপহার দিয়েছেন রসজ্ঞ ভক্তদের। ভক্তপ্রবর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নাম সঙ্কীর্তনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামগানের প্রবর্তন করেন (শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড/১০ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৩৪)। ফলশ্রুতিতে যদিও পদাবলী কীর্তন মূলত রাধা-কৃষ্ণকে ঘিরেই রচিত তবুও অনেক পদকর্তা পরবর্তীতে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরহরিকে কেন্দ্র করেও অনেক পদ রচনা করেছেন।

বৈষ্ণব সম্পৃক্ততা : মহাপ্রভু-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পদাবলী কীর্তনের উপর একধরণের একচেটিয়া দাবি করে থাকেন। তাই পদাবলী কীর্তনকে "বৈষ্ণব পদাবলী" হিসেবেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে- বৈদিক যুগ থেকেই। বিষ্ণুর উপাসকেরাই বৈষ্ণব বলে পরিচিত বিধায় বলা যায় যে, বৈষ্ণবদের উপস্থিতি বৈদিক আমলেই, কেননা বিষ্ণু শব্দের উল্লেখ বেদেও লক্ষিত হয় (ঋগ্বেদ, ১/২২/১৭-২১)। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামক এক ঋষির উল্লেখ আছে (১০/৪২-৪৪ সূক্ত)। দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৭/৬)। শ্রীমতি রাধিকার পূর্বজন্মের কাহিনী তাঁর এ জন্মের কৃষ্ণ-বিরহের পটভূমিকা হিসেবে পাওয়া যায়।

পূর্বজন্মে শ্রীলক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে ভগবান শ্রীহরির ঘরণী। গোলকে একদিন লক্ষ্মীসমা রূপবতী বিরজা সুন্দরী শ্রীহরির সাথে নির্জনে অবস্থান করছিলেন। এ কথা শুনে লক্ষ্মীদেবী ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিতা হয়ে শ্রীহরির নিকটে গমন করলে তাঁর ভয়ে বিরজা নদীর রূপ ধারণ করেন এবং শ্রীহরি পলায়ন করেন। শ্রীহরি কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীর সমীপে আগমন করলে লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরিকে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হন। তা দেখে শ্রীদাম সখা লক্ষ্মীদেবীকে ক্রোধ সংবরণের অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে ফল হল উল্টো। লক্ষ্মীদেবী শ্রীদাম সখাকে পৃথিবীতে অসুররূপে জন্ম নেয়ার অভিশাপ দেন। শ্রীদাম সখা শঙ্খচূড় দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির কৃপায় শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে আবার শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদাম রূপে জন্ম নেন। শ্রীদাম-সখাও লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অভিশাপ দেন যে, লক্ষ্মীদেবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন মনুষ্যরূপে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শতবর্ষ কষ্ট পাবেন (শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, পৃঃ ২১৫-২১৬; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৩৪৪)। সুতরাং বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা যে পদাবলী কীর্তনের উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করেন তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কেননা, বৈষ্ণব ধারার নবজন্মদাতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই শ্রীমদ্ভাগবতকে চতুর্থ প্রস্থান বা রসপ্রস্থান [অন্য তিন প্রস্থান : শ্রুতিপ্রস্থান (বেদ-উপনিষদ), স্মৃতিপ্রস্থান (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা), এবং ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র)] হিসেবে প্রচার করেছেন। এক হিসাবে বলা যায় যে, মহাপ্রভুর পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাই পদাবলী কীর্তনের অন্যতম ধারক ও বাহক।

> **পদাবলী কীর্তন সকল বাঙালির প্রাণের টান, অন্তরের গান। পদাবলী কীর্তন বাঙালির শুধুমাত্র এক অভিনব সৃষ্টিই নয়, তা বাঙালির এক আধ্যাত্মিক অবদানও বটে। পদাবলী কীর্তন একইসাথে সঙ্গীতসাধনা এবং ধর্মসাধনা- মর্ত্য ও অমৃতের মিশ্রণ।**

পদাবলী নামের উৎপত্তি ও তাৎপর্য : পদ শব্দটি বাক্য এবং সঙ্গীত এই দুই অর্থেই ভরতমুনি (খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক) তাঁর "নাট্যসূত্র" পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। কালিদাস তাঁর কালোত্তীর্ণ কাব্য "মেঘদূত"-এ সঙ্গীত অর্থে পদ শব্দের ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গানের যে পুঁথি (চর্যাপদ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় তার নামেও পদ শব্দ পাওয়া যায়। তবে **সঙ্গীত-শ্লোক-**

এই অর্থে প্রথম পদাবলী শব্দটি ব্যবহার করেন পদাবলী কীর্তনের প্রথম পদকর্তা জয়দেব– **"মধুর কোমলকান্তপদাবলীং"** (বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়, পৃঃ ৯)। "তবে বৈষ্ণব-গীতিকবিতাকে 'পদাবলী' আখ্যা দেয়া হয়েছে আধুনিক কালে, অন্তত অষ্টাদশ শতকের আগে নয়। ...মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা-বিষয়ক যে খণ্ড কবিতা ভক্ত বাঙালির চিত্ত বিনোদন করে এসেছে, সাধারণভাবে তাই বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত" (বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা, পৃঃ ১৮)।

পদাবলীতে রাধার আগমন : শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই কোথাও যদিও বিশেষ একজন গোপীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের **"অনয়ারাধিতো"** (১০/৩০/২৮) শ্লোকাংশটি থেকে 'অনয়া' (এর দ্বারা) এবং 'আরাধিতঃ' (আরাধিত) এভাবে ব্যাখ্যা করে পরবর্তীতে বৈষ্ণব আচার্যেরা রাধা নামটি আবিষ্কার করেন। অন্ধ্র দাসবংশীয় রাজা হালের (খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী) "গাথা সপ্তশতী"–তে রাই, কানু এবং গোপীদের উল্লেখ রয়েছে– এটিই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন রাই-কানু যুগল নামের উল্লেখ। গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষদে (৬/খ, ২১/২) এবং গোপালোত্তরতাপনীয় উপনিষদে (১-৩) গোপীদের উল্লেখ আছে যদিও রাধার কোনো উল্লেখ নেই। আনন্দবর্ধন-কৃত (খ্রিষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) "ধ্বন্যালোক"-এ সংকলিত শ্লোকগুলির মধ্যেও দু'টি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার উল্লেখ রয়েছে। অজ্ঞাতনামা সংকলয়িতার সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ "কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়" (খ্রিষ্টীয় ১০ম শতক) গ্রন্থেও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক চারটি শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত", হেমচন্দ্রের "কাব্যানুশাসন", রামচন্দ্রের "নাট্যদর্পণ", কবিকর্ণপুরের "অলঙ্কারকৌস্তভ", পিঙ্গলাচার্যের "প্রাকৃতপৈঙ্গল", বিল্বমঙ্গল রচিত "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে (খ্রিষ্টীয় ১১শ-১৩শ শতাব্দী) রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ আছে (বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়, পৃঃ ১৪-১৬)। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, জয়দেবের "শ্রীগীতগোবিন্দ"-তেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ প্রথমবারের ন্যায় এক পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক রূপ পেয়েছে।

জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ : বাঙালি ভক্তকবি জয়দেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও পূর্ববর্তী। জয়দেব খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। জয়দেবের **"শ্রীগীতগোবিন্দ"** রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-মান-অভিমান নিয়ে রচিত এক কালোত্তীর্ণ রচনা। যদিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং বর্তমান কালের পদাবলী কীর্তনের সাথে সুরগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবুও পদাবলী রচয়িতাগণ "শ্রীগীতগোবিন্দ"-কেই তাদের **'আদি প্রেরণা'** বলে স্বীকার করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় "শ্রীগীতগোবিন্দ" সর্বক্ষণ গীত হয় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের পাশাপাশি শ্রীগীতগোবিন্দের শ্লোকের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

পদাবলী কীর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ : মনে রাখতে হবে, "বৈষ্ণব কবিদের এ-জগৎ বৃন্দাবন-মথুরার কল্পলোক। ...কাহিনী গাঁথা হয়েছে লৌকিক গোপ-গোপীর প্রেমকথার সঙ্গে ভাগবত প্রেমকথাকে মিশিয়ে নিয়ে" (বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়, পৃঃ ২৩৬)। "কৃষ্ণের মধুর ও ঐশ্বর্য-লীলা সম্যক্ প্রকাশিত হয়েছে ভাগবতে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানভাবে আশ্রয় করা হয়েছে কৃষ্ণের মধুর লীলা অর্থাৎ বৃন্দাবন লীলাকে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পরকীয়া প্রেমই এই লীলার প্রধান কথা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরই রাধাকৃষ্ণের এই পরকীয়া প্রেমের তত্ত্ব বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ...শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বৈষ্ণব পদাবলী তার লৌকিক প্রণয়রসের আকর্ষণ ত্যাগ করে পুরোপুরি আধ্যাত্ম রসাত্মক অলৌকিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় পরিণত হয় শ্রোতার কাছে" (বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা, পৃঃ ১৮, ২০)। "কয়েকজন ধ্রুবা-স্মৃতি-সমৃদ্ধ জাতিস্মর সাধক আপন অনুভূতির রঙিন তুলিকায় এই সমস্ত অপার্থিব প্রেমের নিরবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন, যাহার নাম **বৈষ্ণব পদাবলী**। ব্যক্তির অনুভূতি বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তার উপলব্ধি বিশ্বের রসিকজনের আস্বাদ্য বস্তুতে পরিণতি লাভ করিয়াছে" (বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, ভূমিকা, পৃঃ ১৩-১৪)। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। "শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাধন্য বাঙালির জাতীয় জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই জাগরণের জয়গান 'বৈষ্ণব পদাবলী'। ছন্দে তাহার জঙ্গমতা, সুরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে সঞ্জীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুসুমের কোমলতা, লালিত্য এবং সৌরভ। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের দূরাগত প্রতিধ্বনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলোকের সেতুবন্ধ বৈষ্ণব পদাবলী" (বৈষ্ণব পদাবলী, ভূমিকা, পৃঃ ১৭)। শ্রীমতি রাধিকাকে (ভক্তকে) শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান) সকল সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়াস করেছেন। রূপকের আকারে চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ এই প্রচেষ্টার সবিস্তার বর্ণনা, আর বিদ্যাপতির পদাবলীতে আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত। "চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির এই মিলিত ভাবধারার প্রেমময় বিগ্রহ-জঙ্গম হেমকল্পতরু শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহারই প্রভাবে অতি স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব গীতিকবিতার পথ পরিবর্তন ঘটিয়াছে; বৈষ্ণব পদাবলী এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে" (বৈষ্ণব পদাবলী, ভূমিকা, পৃঃ ১৮)। "পদাবলীর বিষয়বস্তুর মুখ্যাংশ রাধাকৃষ্ণ-কথা...পদাবলীতে কানু-কথার তুলনায় রাধা-কথারই প্রধান্য। ...আবার রাধা-কথার প্রাধান্য হলেও বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বিরহ-কথাই শ্রেষ্ঠাংশ" (বৈষ্ণব পদাবলী–পদ ও পদকার, পৃঃ ৩)। মিলনের চেয়ে বিরহের শ্রেষ্ঠত্ব কেন?

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব যদৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ো তদ্ বিরহে ॥"

(অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবি। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়, পৃঃ ১৪৮)

–মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই ভালো। মিলনে প্রেমের শুধু একটিমাত্র মূর্তি দেখা দেয়, বিরহে সমস্ত ভুবন প্রেমের রূপে তন্ময় হয়ে উঠে। মিলন ক্ষণস্থায়ী, বিরহ চিরস্থায়ী। মিলনে আনন্দিত দু'জন, বিরহে ব্যথিত সমগ্র ভুবন। মিলন যেখানে রূপে আবদ্ধ থাকে, বিরহ সেখানে রূপাতীত পর্যায়ে উন্নীত হয়। বিরহরূপ অমৃত প্রেমকে অমরত্ব দান করে (**"বিচ্ছেদ নহিলে প্রেম না উথলে।"** –নিমানন্দ দাস, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১০১২)। "বৈষ্ণব পদাবলীর দু'টি মুখ্য ধারা। এক, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আর দ্বিতীয়টি গৌরবিষয়ক।

দু'টি ধারা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও অন্তরঙ্গ ভাব-সাযুজ্যে এগুলি একেবারে ভিন্ন নয়" (বৈষ্ণব পদাবলী–পদ ও পদকার, পৃঃ ৯৯)। রাধা-বর্ণ ও রাধা-ভাব (**"রাধা-ভাব অঙ্গীকরি রাধার বরণ ধরি।"** –লোচন দাস, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৪৭৪) নিয়েই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

রসগ্রহণের প্রস্তুতি : পদাবলী কীর্তন শ্রবণে বাঙালি শ্রোতামাত্রই ভাবরসে নিমজ্জিত হন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ রসকে হৃদয়ে স্থান দিতে, ভাব ও ভাষাকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে শ্রোতাদের শুধুমাত্র শ্রবণের চেয়েও অধিক প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। নইলে "কানের ভিতর দিয়া" প্রবেশ করলেও মর্মে স্থান পাবে না এবং প্রাণও আকুলিত হবে না।

১) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান (**"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"** শ্রীমদ্ভাগবত, ১/৩/২৮) হলেও তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য না করা হলে পদাবলী কীর্তনের রস গ্রহণে হোঁচট খেতে হবে (দেবকী গর্ভধারিণী জননী হলেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্-স্বরূপ বিস্মৃত হতে পারেননি বিধায় তাঁর মনে কোনোরূপ বাৎসল্য ভাব জাগ্রত হয়নি। কিন্তু পালিতা-মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ বালক ভাবতেন বিধায় তাঁর মনে বাৎসল্য ভাবের ফল্গুধারা আজীবন ও অবিরত প্রবাহিত হয়েছিল)।

২) রক্ষণশীল নৈতিকতার মনোভাব থাকলেও পদাবলী কীর্তনের রস গ্রহণে পরিপূর্ণতা আসবে না। কেননা, পরকীয়া প্রেম কোনো কালেই নৈতিকতার ধার ধারেনি। নৈতিকতাকে পরিহার করেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে শিরোধার্য করতে হবে [**"চৌরি পিরীতি হওএ লাখ গুণ রঙ্গ।"** –বিদ্যাপতি (বাঙালি) –বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১১৯]। তবুও সংসারের অননুমোদিত এই পরকীয়া প্রেমই পদাবলী কীর্তনের প্রধান উপজীব্য কেন? "কৃষ্ণের এই পরকীয়া প্রেমের মধ্যে একটি গভীর সত্যও নিহিত আছে। মানুষ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের নানা রকম বন্ধনে আবদ্ধ বলে এই পৃথিবীর স্বকীয়, কিন্তু ঈশ্বরের পরকীয়। ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে হলে তাই মানুষকে সব বন্ধনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়, সমস্ত লৌকিক সংস্কার ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ছুটে যেতে হয় –পরকীয়ায় অভিসারের মধ্যে এই সত্যেরই ব্যঞ্জনা রয়েছে" (বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা, পৃঃ ২৭)।

৩) আর যে ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ ভগবান হিসেবে স্মরণ করেন, তাঁদেরকে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে যে **"মাধুর্য"** ভাব (আর অন্য চার ভাব হচ্ছে শান্ত, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য) রয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে দেখতে হবে। **"√রাধ"** ধাতু (যার অর্থ অর্চনা, তপস্যা বা আরাধনা করা) থেকে রাধা শব্দের উৎপত্তি (বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১৯১৩)। **রাধিকা আরাধিকা।** নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদানকালে যমরাজ এক রূপকের মাধ্যমে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ককে প্রকাশ করেন। রৌদ্র ব্যতীত যেমন ছায়ার উৎপত্তি হয় না তেমনি পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মার সৃষ্টি হয় না। আবরণের বিলুপ্তিতে ছায়াও অদৃশ্য হয়ে যায় রৌদ্রের মধ্যে। অজ্ঞানতার দূরীকরণে জীবাত্মাও পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায় (কঠ উপনিষদ, ১/৩/১)। সমভাবে, রাধাও (জীবাত্মা বা ভক্ত) কৃষ্ণের (পরমাত্মা বা ভগবান) সাথে মিলিত হতে চাইবেন তা-ই স্বাভাবিক, চূড়ান্ত পরিণতি।

শুভারম্ভ : ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে তাল-লয় সহকারে সঙ্গীতাকারে পরিবেশনের নামই কীর্তন। "এই কীর্তন নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন ভেদে দুই প্রকার। নামকীর্তনে শ্রীহরির নাম ও করুণার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্তনে তাঁহার রূপ গুণ ও বিবিধ মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে" (বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পৃঃ ৫৭)। এছাড়া "ঢপ্" কীর্তন নামেও আরেক ধরনের কীর্তন আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা নামকীর্তন (১০/১৫/২) ও লীলাকীর্তন (১০/৩০/১৪-৩৪) এ দু'য়েরই পরিচয় পাই। লীলাকীর্তনই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান কালের পদাবলী কীর্তনের রূপ ধারণ করেছে।

একবার (খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে) কয়েকটি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরীতে নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩৪-১৬১৫ খিস্টাব্দ) একটি বৈষ্ণব-সম্মেলনের আয়োজন করেন যার অধিনেত্রী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীজাহ্নবী দেবী। "এই সম্মেলনে নরোত্তম কীর্তনগানের রসকীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল" (বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পৃঃ ৬৬)। "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরই ব্রজমণ্ডল হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া বাঙালায় আসিয়া কীর্তনে তাহা প্রয়োগ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সঙ্গীতধারা ধ্রুপদের লক্ষণাক্রান্ত। পরে রাঢ়ের প্রচলিত ধারাকে সংশোধিত করিয়া কীর্তনের মনোহরসাহী ধারার প্রচলন হয়। বহু পরে বাঙালার গায়কগণ ব্রজমণ্ডলে রাঢ়ের সঙ্গীত ধারা লইয়া গিয়াছিলেন" (বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পৃঃ ১৫, ১৮)। "নাম-কীর্তনের ধারা নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল মহাপ্রভুর সমকালেই। খেতরীর মহোৎসবে লীলা-কীর্তনের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়া গেল" (বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পৃঃ ৯০)।

কতিপয় পদ ও পদাবলী :

গবেষক-সাধক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী" পুস্তকে প্রায় দুইশ পদকর্তার রচিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন করেছেন। সেখান থেকে প্রচলিত ও জনপ্রিয় কিছু পদের ও তৎসঙ্গে পদকর্তাদের উল্লেখ নিম্নে দেয়া হল। আমরা যখন পদাবলী কীর্তন মগ্ন হয়ে শুনি, তখন সে পদগুলির রচয়িতাদের নাম খুব কম সময়েই জানি। আবার মূল পদগুলির সামান্য পরিবর্তন করে অনেকে অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন। নিম্নে কতিপয় জনপ্রিয় পদের অংশ ও পদকর্তাদের উল্লেখ করার ফলে পরবর্তী সময়ে আমরা যখন কোন পদাবলী কীর্তন শুনতে পাব তখন সে পদগুলির সাথে কণ্ঠ মিলাবার সময় পদকর্তাদেরও স্মরণ করতে পারব।

১) **"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্ন।"** –জয়দেব (শ্রীগীতগোবিন্দ, মানভঞ্জন, পৃঃ ২০) –তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্নস্বরূপ।

২) **"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনস্ দেহি পদপল্লবমুদারম্।"** –জয়দেব (শ্রীগীতগোবিন্দ, মানভঞ্জন, পৃঃ ২০) –কামবিষ-বিনাশক আমার শিরোভূষণ তোমার ঐ পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর। প্রচলিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে রাধার পদস্থাপন নিয়ে ভক্তকবি বিচলিত, দোদুল্যমান ছিলেন। কবিতার ছত্রের এই অংশটুকু (**"দেহি পদপল্লবমুদার"**) না লিখে নদীতে স্নান করতে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে জয়দেবের রূপ ধরে এসে ভক্তের

অসম্পূর্ণ অংশটুকু স্বয়ং সম্পূর্ণতা দান করেন। সুতরাং বলা যায় যে, এই ছত্রটি ভক্ত ও ভগবানের মিলিত প্রয়াসের ফল।

৩) **"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।**
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।"

–বড়ু চণ্ডীদাস (পৃ: ৪৩)

৪) **"কি মোহিনী জান বধূ কি মোহিনী জান।**
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥"

–বড়ু চণ্ডীদাস (পৃ: ৪৩)

[তরুণ মজুমদার পরিচালিত এবং অনুপ কুমার ও সন্ধ্যা রায় অভিনীত "নিমন্ত্রণ" ছবিতে গীত]

৫) **"এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।**
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু।"

–বড়ু চণ্ডীদাস (পৃ: ৪৪)

৬) **"চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী।**
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥"

–বড়ু চণ্ডীদাস (পৃ: ৪৮)

৭) **"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।**
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে।
না শুনে কাহার কথা।"

–দ্বিজ চণ্ডীদাস (পৃ: ৪৯)

[বিকাশ রায় - সাবিত্রী অভিনীত "দুই বোন" ছবিতে গীত]

৮) **"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।**
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"

–দ্বিজ চণ্ডীদাস (পৃ: ৫০)

৯) **"সই কেমনে ধরিব হিয়া।**
আমার বধূয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

–দ্বিজ চণ্ডীদাস (পৃ: ৫৬)

[সমরূপ : জ্ঞানদাস (পৃ: ৪৩৯)]

১০) **"বহুদিন পরে বধূয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥**
এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলেত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি ॥"

–দ্বিজ চণ্ডীদাস (পৃ: ৬৮)

[উত্তম-কাবেরী বসু অভিনীত "রাইকমল" ছবিতে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গীত]

১১) **"চম্পক বরণী বয়সে তরুণী।**
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে যেমনি
কপিলা চামর পারা ॥"

–দীন চণ্ডীদাস (পৃ: ৬৯)

১২) **"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।**
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥"

–বিদ্যাপতি (মৈথিলী) (পৃ: ১১১)

–মাধব, তোমাকে অনেক মিনতি করছি। তিল-তুলসী দিয়ে তোমার পদে আমার এ দেহ সমর্পণ করলাম, আমার প্রতি দয়াবিমুখ হয়ো না।

১৩) **"দারুন বসন্ত যত দুখ দেল।**
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥"

–বিদ্যাপতি (বাঙালি) (পৃ: ১৪১)

[উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত "নবজন্ম" ছবিতে গীত]

১৪) **"না সো রমণ না হাম রমণী।**
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি ॥"

–রায় রামানন্দ (পৃ: ১৪৬)

১৫) **"শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে**
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥"

–মুরারি গুপ্ত (পৃ: ১৪৭)

১৬) **"শয়নে গৌর স্বপনে গৌর**
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা ॥"

–নরহরি সরকার (পৃ: ১৫৩)

১৭) **"রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।**
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে ॥"

–বংশীবদন (পৃ: ২৭৩)

১৮) **"সখি হামারি দুখের নাহি ওর।**
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥"

–রায় শেখর (পৃ: ৩৩৭)

১৯) **"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।**
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥"

–জ্ঞানদাস (পৃ: ৪১৫)

২০) **"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু**
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥"

–জ্ঞানদাস (পৃ: ৪৩৯)

২১) **"তোমার গরবে গরবিনি হাম**
রূপসী তোমার রূপে।"

–জ্ঞানদাস (পৃ: ৪৬৮)

২২) **"চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।"**

–লোচন দাস (পৃঃ ৪৮১)

[উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত "নবজন্ম" ছবিতে গীত]

২৩) **"ছুঁইয় না ছুঁইয় না নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥"**

–গোবিন্দ দাস (পৃঃ ৬৫১)

২৪) **"মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥"**

–গোবিন্দ দাস চক্রবর্তী (পৃঃ ৬৯১)

উপসংহার : রাসলীলা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা পদাবলী কীর্তন প্রসঙ্গেও প্রণিধানযোগ্য ও প্রযোজ্য। রাসলীলায় রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানে "শুদ্ধ ভক্তেরই প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে– কারণ সংসারের আর কোনো প্রেমই নরনারীর পরস্পরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা অধিকতর নহে। যেখানে এইরূপ প্রবল অনুরাগ, সেখানে কোনো ভয় থাকে না এবং কোনো আসক্তি থাকে না, শুধু এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে" (ভক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন, পৃঃ ৫৭)। পদকর্তাগণ ষড়ৈশ্বর্যের (সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য) অধিকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের পদগুলিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-মান-অভিমান প্রকাশে শরীরী ভাবের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে (**"শরীর ছাড়িলে পিরীতি রহিবেক কোথা।"** –দ্বিজ চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৬৭)। প্রকৃত প্রেম প্রারম্ভে দেহজ (জাগতিক) হলেও অন্তিমে দেহাতীত (আধ্যাত্মিকতায়) পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। তাই মানসিকভাবে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও পবিত্র স্বভাব না হলে পদাবলী কীর্তনের ভাব সুদূরপরাহত হবে শ্রোতার নিকট। পদাবলী কীর্তনের মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে হলে সেই লৌকিক বর্ণনাকে ছাড়িয়ে দিব্যতার দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকেই আমাদের মনকে পরিচালিত করতে হবে। না হলে পদাবলী কীর্তনের কেবলমাত্র ভাষাটাকেই আমরা গ্রহণ করব, ভাবটাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হব না। আসুন পদাবলী কীর্তনের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাই যেন শ্রীহরির এই বিহারলীলা আমাদের কামাদি কলিকলুষের বিনাশ-সাধন করে। **"কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিত"** –জয়দেব, (শ্রীগীতগোবিন্দ, বিপ্রলব্ধা, পৃঃ ১৫)।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১) বেদব্যাস বিরচিত **শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ**, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

২) **ঋগ্বেদ-সংহিতা**– রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২০১০ খ্রিস্টাব্দ)

৩) **উপনিষদ** (অখণ্ড সংস্করণ)– অনুবাদ ও সম্পাদনা : অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

৪) **সংস্কৃত-বাংলা অভিধান**– শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

৫) **সরল বাঙালা অভিধান**– সম্পাদনা : সুবল চন্দ্র মিত্র, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি., কলিকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

৬) **বঙ্গীয় শব্দকোষ**– হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

৭) **বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া**– ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

৮) **বৈষ্ণব পদাবলী : পদ ও পদকার**– ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৯) বেদব্যাস বিরচিত **শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ**, পদ্যানুবাদঃ শ্রীকালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

১০) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**– ব্যাখ্যাতা : জগদীশচন্দ ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

১১) **ভারতের সাধক ও সাধিকা** (অখণ্ড রাজসংস্করণ)– সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (২০১১ খ্রিস্টাব্দ)।

১২) **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**– শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

১৩) **স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন**, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

১৪) **বৃহৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত**– শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

১৫) **বৈষ্ণব পদাবলী**– সম্পাদনা : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৬) **বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়**– নীলরতন সেন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ (২০১৩ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭) **উপনিষদ সংগ্রহ– সংকলন ও ভাষান্তর** : চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, গ্রন্থিক সংস্করণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

১৮) **বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা**– হীরেন চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ। ❑

নিউ ইয়র্ক, ডিসেম্বর ২৩, ২০১৭ - ডিসেম্বর ২৮, ২০১৮

তুলসীদাস

সংযুক্তা বিশ্বাস

ভারতবর্ষ ঋষি মুনিদের দেশ। এ দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে জানা অজানা সাধুসন্তদের পবিত্র তপস্যার ফল। যার নির্যাসে এ দেশের বাতাসে মিশে আছে ঈশ্বরের নামগান। নদী যে পথ ধরেই এগোক না কেন, পৌঁছাবে তো সেই সাগরেই। তাই এখানে যে যেভাবে সাধনা করেছেন, তার মধ্য দিয়েই সেই এক ও অদ্বিতীয় অনাদি ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে সর্বত্র। বারবার বিবিধ তপঃশ্চারীর রূপ ধরে তিনি জগতকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এসেছেন এই মর্ত্যধামে।

রামায়ণ লিখেছিলেন আদিকবি বাল্মিকী। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সেই আদিকাব্য হিন্দিতে অনুবাদ করেন তুলসীদাস। তাঁর রামচরিতমানসের মধ্য দিয়ে মহাকবি বাল্মিকী যেন পুনরায় ফিরে এসেছিলেন মর্ত্যে। একজন হিন্দু সন্ত, অসাধারণ কবি এবং দার্শনিক ছিলেন তুলসীদাস। শোনা যায়, জন্মের আগে তুলসীদাস ১২ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং জন্মের সময় তার শারিরীক অবস্থা ছিল পাঁচ বছর বয়সী বালকের মত। জন্মের সময় তিনি অন্য শিশুদের মত কেঁদে ওঠেননি, তার মুখ দিয়ে 'রাম' শব্দ বের হয়। এজন্য তাঁর নামকরণ হয়েছিল রামবোলা। জন্মানোর পর তাঁর জন্মসময়ের প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে জ্যোতিষীর কথায়, তাঁর মা-বাবা হুলসী এবং আত্মারাম দুবে তাঁকে জন্ম হবার চতুর্থ দিনের মাথায় পরিত্যাগ করেন। কেউ বলেন তাঁরা ছিলেন পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আবার কেউ বলেন তারা কাণ্যকুব্জ কিংবা সন্ধ্যা গোত্রারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত তুলসীদাস আশ্রয় পেলেন মাতা হুলসীরই এক চাকরাণী ছুনিয়ার (কেউ বলেন মুনিয়া) কাছে।

> **জন্মের সময় তিনি অন্য শিশুদের মত কেঁদে ওঠেননি, তার মুখ দিয়ে 'রাম' শব্দ বের হয়। এজন্য তাঁর নামকরণ হয়েছিল রামবোলা। জন্মানোর পর তাঁর জন্মসময়ের প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে জ্যোতিষীর কথায়, তাঁর মা-বাবা হুলসী এবং আত্মারাম দুবে তাঁকে জন্ম হবার চতুর্থ দিনের মাথায় পরিত্যাগ করেন।**

ছুনিয়া এই শিশু তুলসীদাসকে নিয়ে তার নিজস্ব গ্রাম হরিপুরে প্রস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি শিশু তুলসীদাসের দেখাশুনা করতে থাকেন। তুলসীদাসের যখন মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়স তখন ছুনিয়ার মৃত্যু হয় এবং বালক রামবোলা তখন সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে অন্ন সংগ্রহ করা ছাড়া তার তখন আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। কথিত আছে এবং অনেকে বিশ্বাস করেন যে মাতা পার্ব্বতী এক ব্রাহ্মণ রমণীর বেশে এসে রামবোলাকে প্রতিদিন অন্ন দান করে যেতেন। এরপর নরহরিদাস, বৈষ্ণব চুড়ামনি রামানন্দ সম্প্রদায়ের অনন্তচার্যের শিষ্য রামবোলাকে দত্তক নেন এবং দীক্ষা দান করেন, তখন থেকেই তাঁর নতুন নামকরণ হয় তুলসীদাস। নরহরিদাসই অযোধ্যাতে গিয়ে তাঁর উপনয়ন করান এবং রামায়ণের ভাষ্যপাঠ তিনি প্রথম শোনেন শ্রীগুরুর কাছেই। তুলসীদাসের স্ত্রী ছিলেন এক অতি মহিয়সী রমণী– রত্নাবলী। শোনা যায় তুলসীদাসের আধ্যাত্ম জীবনের শুরুতে তার প্রভাব ছিল।

এক মহান সাধক তথা কবি তথা দার্শনিক হিসেবে আমরা তুলসীদাসকে উপলব্ধি করতে পারবো। তার অপূর্ব সৃষ্টিরস আজও তাঁকে বিশ্বের দরবারে স্মরণে রেখেছে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে রামচরিতমানস, হনুমান চালিশা, বৈরাগ্য সন্দীপনী, দোঁহাবলী, কবিতাবলী, জানকী মঙ্গল, পার্ব্বতী মঙ্গল ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার জীবনের বেশিরভাগ সময়, এমনকি জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত হয় বারাণসীতে। এখনও বারাণসীতে তাঁর নামে 'তুলসী ঘাট' আছে। বারাণসীর সংকটমোচন মন্দিরটির প্রবর্তক ছিলেন তুলসীদাস। তাঁর জন্ম সম্পর্কে সঠিক সন কিংবা তারিখ জানা যায়নি। কিন্তু জানা যায় তিনি প্রায় ১২৬ বছর দেহে ছিলেন এবং ১৬২৩ সনে বারাণসীতেই তার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন মহান তপস্বী বিরল। ❑

সূত্র : প্রচলিত কথা অনুসারে

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

অজয়কুমার ভাণ্ডারী

নির্মাণ ও সৃজনের আদি দেবতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা। তাঁকে সৃষ্টির প্রথম সূত্রধর বলা হয়। তিনি সৃষ্টি কর্মের মূল উদ্গাতা। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা ও নিয়ামক। বৈদিক সাহিত্যে বিশ্বকর্মাকে পরমেশ্বর উপাধি প্রদান করা হয়েছে। ইন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির বিশেষণ হিসাবে বিশ্বকর্মা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের একটা মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক বাহু, অনেক পাদ। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী। পুরাণে অবশ্য বিশ্বকর্মাকে ভুবনপুত্র, ত্বষ্টাপুত্র আবার কখনো প্রভাস পুত্র বিশ্বকর্মা বলা হয়েছে। কথিত আছে, সমুদ্র মন্থনের সময় বিশ্বকর্মার আবির্ভাব হয়। স্কন্দপুরাণ অনুসারে মহর্ষি আঙ্গিরার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহস্পতির ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাহিনী ছিলেন। অষ্টম বসু প্রভাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিশ্বকর্মা তাঁদেরই সন্তান। স্থাপত্য শাস্ত্র তাঁরই সৃষ্টি। পুরাণে বিশ্বকর্মার অনেক অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। বেদের এক ঋষির নামও বিশ্বকর্মা। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণের মতো বিশ্বকর্মাও চতুর্বাহু। তাঁর চার হাতে আছে পাশ, জলপাত্র, পুস্তক ও জ্ঞানসূত্র। তাঁর বাহন হংস (অথবা হাতি)। তিনি সর্বদৃষ্টি ধারক, শুভমুকুটধারী ও বৃদ্ধকায়াযুক্ত। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে তিনি তাঁকে প্রজাসৃষ্টির জন্য নির্দেশ দিলেন। বিষ্ণুকে তিনি বিশ্বপালনের দায়িত্ব দিলেন এবং সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য তাঁকে শক্তিশালী সুদর্শন চক্র প্রদান করলেন। মহেশ্বরকে সৃষ্টি করে তাঁকে সৃষ্টি ধ্বংস করার ক্ষমতা দিলেন।

নারায়ণের মতো বিশ্বকর্মাও চতুর্বাহু। তাঁর চার হাতে আছে পাশ, জলপাত্র, পুস্তক ও জ্ঞানসূত্র। তাঁর বাহন হংস (অথবা হাতি)। তিনি সর্বদৃষ্টি ধারক, শুভমুকুটধারী ও বৃদ্ধকায়াযুক্ত। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টিকর্তা।

সৃষ্টি কার্যের বিস্তার ঘটানোর জন্য পঞ্চানন বিশ্বকর্মা তাঁর সদ্যোজাত মুখ থেকে সনগ, বামদেব মুখ থেকে সনাতন, অঘোর মুখ থেকে অহিভুন, তৎপুরুষ মুখ থেকে প্রত্ন এবং ঈশান মুখ থেকে সুপর্ণ ঋষিকে সৃষ্টি করলেন। এরা হলেন গোত্র প্রবর্তক ঋষি।

বিশ্বকর্মার পত্নী হলেন গায়ত্রী দেবী। বিশ্বকর্মা প্রণীত শিল্পশাস্ত্র সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর। শিল্প বিজ্ঞানকে পাঁচটি বিশেষ ধারায় বিভাজন করে ব্রহ্মাণ্ডে সেই জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি পাঁচজন শিল্পাচার্য পুত্রের জন্ম দিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র মনু ছিলেন গোত্রীয় লৌহ কারিগর। তিনি আঙ্গিরা ঋষির কন্যা কাঞ্চনার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র ময় সনাতন গোত্রের কাষ্ঠ শিল্পী। তিনি পরাশর কন্যা সৌমাকে বিবাহ করেন। তৃতীয় পুত্র ত্বষ্টা ছিলেন গোত্রীয় ধাতু শিল্পী। তাঁর পত্নী কৌশিক মুনির কন্যা জয়ন্তী। চতুর্থ পুত্র ছিলেন প্রত্না গোত্রীয় ভাস্কর। পঞ্চম পুত্র দেবজ্ঞ হলেন সুপর্ণ গোত্রীয়। তিনি স্বর্ণ শিল্পী ও মণিকার। তাঁর পত্নী হলেন চন্দ্রিকা।

বর্তমান যুগের এই পাঁচ শ্রেণির শিল্পীসমাজ সকলেই নিজেদের বিশ্বকর্মা পরিবারের বংশধর বলে পরিচয় দেন। দেব কারিগর বিশ্বকর্মা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি– এই চার যুগ ধরে অনেক রাজধানী, নগর, রাজপ্রাসাদ, দেবায়তন ও অন্যান্য স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। সত্যযুগে বিশ্বকর্মা দেবগণের বাসস্থান স্বর্গপুরী নির্মাণ করেন। এছাড়া ইন্দ্রপুরী, যমপুরী, কুবেরপুরী, শিবমণ্ডলপুরী, দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদ নগরী দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেন। কথিত আছে বিশ্বকর্মা একরাতের মধ্যে দ্বারকার নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। কলিযুগে বিশ্বকর্মার নির্মাণ শিল্প হল হস্তিনাপুরী, পাণ্ডবপুরী, সুদামাপুরী প্রভৃতি। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহ কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন চক্র বিশ্বকর্মার কীর্তি।

দেবদেবীগণের অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারাদি সকলই বিশ্বকর্মার শিল্প কর্ম। শিবের ত্রিশূল, সুদর্শন, যমের কালদণ্ড তিনি নির্মাণ করেন। দধিচি মুনির অস্থি দিয়ে মহাশক্তিশালী বজ্র নির্মাণ করে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে দান করেন।

মহিষাসুর নিধনের সময় দেবী দুর্গাকে তিনি অত্যুজ্জ্বল কুঠার, অন্যান্য অস্ত্রাদি ও অভেদ্য কবচ নির্মাণ করে দেন। যে রথে চড়ে মহাদেব বিদ্যুন্মালী, কমলাক্ষ ও তারকাসুরকে বধ করেন, সেই রথ বিশ্বকর্মারই সৃষ্টি। কথিত আছে, বিশ্বকর্মার শিল্পদক্ষতা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, তাঁর নির্মিত পাদুকা পায়ে জলের ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যেত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি পুরুষ বিশ্বকর্মাদেবের আরাধনা চলে আসছে।

ভারত ও নেপালের সর্বত্র বিশ্বকর্মা পূজা হয়। প্রতিবছর বাংলা ভাদ্র মাসের শেষ দিনটিতে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়। এই দিনটিকে কন্যা সংক্রান্তি বলে। তাছাড়া বছরে আরও দু'বার বিশ্বকর্মা পুজোর অনুষ্ঠান হয়। অনেকে এই দিনটিকে বিশ্বকর্মা জয়ন্তী হিসাবে পালন করেন। তবে ভাদ্র সংক্রান্তি বিশ্বকর্মার জন্মতিথি নয়। মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বিশ্বকর্মার আবির্ভাব হয়। ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, বাংলা, ওড়িশ্যা ও পূর্বভারতের রাজ্যগুলিতে ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পুজো হয়। দোকান, কলকারাখানা, অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ধুমধাম সহকারে বিশ্বকর্মা পুজোর অনুষ্ঠান চলে। যেকোন শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের কাছে বিশ্বকর্মা পূজা একটি পবিত্র দিন। এদিন কর্মবিরতি পালন করা হয়। পুজোর সময় বিশ্বকর্মার বিগ্রহের সামনে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা হয়। বিশ্বকর্মার বাহন হাতিকেও পুজো করা হয়। কর্মস্থলের বাধাবিঘ্ন দূরীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য বিশ্বকর্মাদেবের চরণে প্রার্থনা জানানো হয়।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এবং মহারাষ্ট্রে ও মধ্যপ্রদেশে মাঘ মাসে বিশ্বকর্মা পুজো হয়। এই দিনটি হল শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী বিশ্বকর্মা জয়ন্তী তিথি। দক্ষিণ ভারতে কেরালায় ঋষি পঞ্চমীতে বিশ্বকর্মার আরাধনা করা হয়। ঋষি পঞ্চমী হল ভাদ্র মাসে গণেশ চতুর্থীর পরের দিন। শ্রুতি বচন অনুযায়ী বিবাহ, যজ্ঞ, গৃহ প্রবেশ ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানে বিশ্বকর্মা পুজো করা বিধেয়। লোককল্যাণকারী বিশ্বকর্মাদেব লাঙ্গল সৃষ্টি করে শিল্প ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা করেছেন। গৃহী মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল বস্তু তিনি দান করেন। তাঁর মতো সামাজিক সাম্য বিধানকারী দেবতা আর দেখা যায় না। দেব মানবের সদাহিতকারী, সর্বকর্মের ধারক, শিল্পকলাধিপতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার জনক বিশ্বকর্মাদেবের পূজার্চনা করলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শ্রীবুদ্ধি ও শান্তিলাভ হয়। ❑

Shaaz Academy of Defensive Driving

Tel: 416-756-1044

আমাদের সেবাসমূহ–

- আপনাকে একজন ক্যানাডিয়ান মানের দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করা
- ড্রাইভিং টেকনিকসমূহ আপনার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ ও সহজ করা
- ন্যূনতম সময় ও অর্থ ব্যয়ে টরন্টো থেকে লাইসেন্স পেতে সহযোগিতা করা
- আপনার প্রার্থীত সময়ে টেষ্ট বুকিং দেয়া

ব্যবস্থাপনায়ঃ
অজয় বনিক
ব্যস্ত সড়কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণই
আমাদের প্রকৃত বন্ধু
নিরাপদ ড্রাইভিং শেখার
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

Mr. Ajoy

416-756-1044

গয়াতীর্থে পিণ্ডদান শ্রেষ্ঠ কেন?

অরুণ মুখোপাধ্যায় ও দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)

আত্মা বিদেহী হলে স্থূল শরীরটা পড়ে থাকে। পরম্পরা অনুসারে দেহটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়। একেই বলে শেষকৃত্য। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই স্থূল মরশরীরটা চিতায় রাখতে রাখতেই শুরু হয় পিণ্ডদান ক্রিয়া। আত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত পিণ্ডই বিদেহী বা পিতৃপুরুষের আহার। পিতৃপক্ষে, মহালয়ায় গয়াক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের পিণ্ডদানের জন্য লাখ মানুষ আসেন। গয়াতীর্থে যেকোনো দিনেই পিণ্ডদান চলে। পূর্বপুরুষেরা উত্তর পুরুষের পিণ্ডদানের অপেক্ষায় থাকেন।

গয়া শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্র। গয়াকে কেউ বলেন প্রেতপুরী। কেউ বা বলেন মুক্তিক্ষেত্র। প্রয়াত ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম নেই। সকল তীর্থের আধার বলে গয়া সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। যাঁর পুত্র কোনোভাবে একবার গয়ায় গেছেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন, ব্রজভূমিতে মৃত্যু ও কুরুক্ষেত্রে বাসের ফল লাভ করেন। গয়াশ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য, নিয়ম-কানুন নিয়ে লিখেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় ও দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)।

গয়াতীর্থে গয়াকৃত্য

অরুণ মুখোপাধ্যায়

মায়ের কাজ করতে আমি প্রথমবার গয়ায় যাই। গয়া শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্র। গয়াকে কেউ বলেন প্রেতপুরী। কেউ বা বলেন মুক্তিক্ষেত্র। বিষ্ণুপদ মাথায় ধারণ করে গয়াসুর এই ক্ষেত্রে জাগ্রত রয়েছেন। গয়াসুরের নামে গয়া, নাকি ত্রেতা যুগের 'গয়' রাজার নামে গয়াক্ষেত্র তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু দশ মাইল বিস্তৃত এই গয়াক্ষেত্রের নাম যে স্বয়ং বিষ্ণু রেখেছিলেন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

দানবদের মধ্যে গয়াসুর অত্যন্ত বলবান ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। কোলাহল পর্বতে বহু হাজার বছর ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে গয়াসুর গভীর তপস্যা করছিলেন। গয়াসুরের উচ্চতা ১২৫ যোজন। স্থূলতা ৬০ যোজন। এই তপস্যায় দেবতারা চিন্তিত হলেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে কৈলাসে গেলেন। শিব পরামর্শ দিলেন বিষ্ণুর কাছে যেতে। সকলে শ্রীবিষ্ণুর কাছে গিয়ে গয়াসুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করলেন।

শ্রীবিষ্ণু এবার গয়াসুরের কাছে পৌঁছালেন। তাঁকে বললেন, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর চাও। গয়াসুর প্রত্যুত্তরে বললেন, হে ভগবান, আপনারা যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই বর দিন যাতে আমাকে স্পর্শ করে যাবতীয় সুর, অসুর, মুনি, ঋষি সবাই পবিত্র হয়ে যাবেন ও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন। দেবতারা ভাবলেন না– বললেন, তথাস্তু।

কেবলমাত্র মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মরণে থাকলেই কি ভগবত ভাব পাওয়া যায়? আশ্চর্য কথা। সারাজীবন ঈশ্বর বহিঃমুখ থেকে শেষটায় একটু ভগবানকে ডাকলেই হল! তবে তো ওই কৌশলটা জেনে নিলেই হয়। তাহলে অনেকেই জীবনভর যথেচ্ছ আচরণ করে শেষকালে ভগবান চিন্তা করে পরমগতি লাভ করতে পারে।

ফলে ত্রিলোক ও যমপুরী শূন্য হল। সকলেই গয়াসুরকে দর্শন ও স্পর্শ করে বৈকুণ্ঠে যেতে লাগলো। যমরাজ ও দেবরাজ প্রমাদ গুনলেন। ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। যাওয়া হল বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু সব শুনে ব্রহ্মাকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি গয়াসুরের কাছে গিয়ে যজ্ঞের প্রয়োজনে তারই দেহ প্রার্থনা করুন।

তাই করা হল। গয়াসুর জানালো তাঁর জন্ম ও তপস্যা দুই-ই সার্থক হয়েছে। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মা তার কাছে উপস্থিত। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ভ্রমণ করে যেসব তীর্থ দেখেছি তার মধ্যে যজ্ঞের উপযুক্ত কোনো পবিত্র তীর্থই দেখতে পাচ্ছি না। বিষ্ণুর বরে তোমার দেহ সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র। যজ্ঞের জন্য তোমার ওই পবিত্র দেহ আমায় দান কর।

গয়াসুর আনন্দ পেলেন। তাঁর এই শরীর দেবতাদের যজ্ঞে ব্যবহৃত হবে। বললেন, আপনাদের দ্বারাই আমার শরীর পবিত্র হয়েছে, অতএব এই শরীরের উপর আপনারা যজ্ঞ করুন। গয়াসুর কোলাহল পর্বতের নৈঋত দিককে আশ্রয় করে উত্তরে মাথা ও দক্ষিণে দু'টি পা রেখে দণ্ডের মতো মাটিতে শুয়ে পড়লেন। যজ্ঞ শুরু হলো। যজ্ঞ শেষ হলো। গয়াসুরের শরীর অচল হলো না। ব্রহ্মা ধর্মরাজকে বললেন, তোমার গৃহে যে শিলা জন্মেছে তা এনে গয়াসুরের মাথায় স্থাপন কর। গয়াসুরের মাথায় ধর্মশিলা বসিয়েও গয়াসুরকে অচল করা গেল না। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বললেন। বিষ্ণু নিজ শরীর থেকে এক মূর্তি বের করে ব্রহ্মাকে দিলেন। ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু মূর্তি গয়াসুরের শরীরে স্থাপন করলেন। হায়! গয়াসুর তাতেও নিশ্চল হলেন না।

তখন স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগর থেকে এসে ওই ধর্মশিলার ওপর অবস্থান করলেন। শ্রীবিষ্ণু নিজের গদার আঘাতে গয়াসুরের দেহকে নিশ্চল করে তাঁর মাথার উপর নিজের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করে বর দিলেন–

'যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রাকর্তারকাঃ।
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরা ॥
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়া শিরঃ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি তানি বৈ ॥
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তু হে।"

পৃথিবী, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, তারা যতদিন থাকবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতা এই শিলায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। পাঁচ ক্রোশ গয়াক্ষেত্র ও ক্রোশমাত্র গয়াশির। এর মধ্যে সমস্ত তীর্থ অবস্থান করে মানুষের মঙ্গলবিধান করবে। এই ক্ষেত্রে যাঁর হিতার্থে সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করা হবে তাঁর ব্রহ্মলোকে স্থান হবে।

সেই থেকে গয়াসুরের নামে গয়াতীর্থ। আর শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন নাম নিল শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম। শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং এই তীর্থে সকল মানুষের পাপ নাশ করেন। গয়াসুরের প্রার্থিত ও লব্ধ বরে গয়ার সমস্ত তীর্থে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানে হাজার হাজার কুল উদ্ধার হয়ে যায়।

মায়ের কাজ করতেই আমার গয়া যাওয়া। তারপরও বেশ কয়েকবার গয়া গেছি। প্রথমবার যে ভয়-ভয় ভাব ছিল তা কেটে যেতে দেরি হয়নি। গয়ায় কোনো প্রকার কালশুদ্ধির ব্যাপার নেই। প্রয়াত ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম নেই। নিজ বাড়িতে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে তারপর গয়ায় পিণ্ড দেয়া যায়। সকল তীর্থের আধার বলে গয়া সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। যাঁর পুত্র কোনোভাবে একবার গয়ায় গেছেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন, ব্রজভূমিতে মৃত্যু ও কুরুক্ষেত্রে বাসের ফল লাভ করেন। গয়ার মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো তীর্থ নেই। পঞ্চক্রোশী গয়াক্ষেত্রের যেকোনো স্থানে পিণ্ডদান করলে পুত্রের পিতৃমাতৃঋণ শোধ হয় বলে বিশ্বাস। গয়াক্ষেত্রে এক ক্রোশ অঞ্চলে যেখানে 'গয়াশির' আছে সেখানে পিণ্ডদান একশত কুলের উদ্ধার হয়। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডার্পণে সহস্র কুলসহ পিণ্ডদাতা নিজেও উদ্ধার হয়ে যায়।

গয়াতে যবের আটা, ঘি, দুধ, মধু, দই, কলা ও কালো তিল সহযোগে পিণ্ডদান হয়। দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের অন্নের পিণ্ড দিতে দেখেছি। 'মুষ্টিমাত্র প্রমাণঞ্চ' –গয়াশ্রাদ্ধে পিণ্ডের পরিমাণ এক মুষ্টি। শমীপত্রের পরিমাণ পিণ্ড দিলেও গয়ায় আত্মার মুক্তিলাভ ঘটে। 'শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে।'

গয়াসুরের মস্তক পড়েছিল বিহারের গয়ায়। বিষ্ণুর প্রভাবে গয়াসুর নিশ্চল হলে তাঁর বিশাল দেহের নাভিদেশ পতিত হয়েছিল উড়িশ্যার যাজপুরে। বৈতরণী নদীতীরের যাজপুর তাই নাভিগয়া নামে পরিচিত। যাজপুরের মন্দির প্রকোষ্ঠে একটি গভীর কূপ আছে। ওই কূপের নাম নাভিগঙ্গা। বৈতরণীতে স্নান করে নাভিগঙ্গায় পিণ্ডদানে সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয়। অন্যমতে, শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীদেহ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে দেবীর নাভিদেশ নাভিগয়া বা বিরজা ক্ষেত্রে পড়েছিল।

গয়াসুরের পা পড়েছিল রাজমহেন্দ্রীর পাদগয়ায়। গোদাবরী নদীর তীরে পাদগয়ায় বিষ্ণুমন্দিরে যে জলাশয় রয়েছে সেটিই পিণ্ডদানের কুণ্ড। প্রচলিত বিশ্বাস– গয়ায়, নাভিগয়ায় ও পাদগয়ায় পিণ্ডদানে একই ফল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যে গয়াতীর্থ রয়েছে, সেখানে মন্মথ নদের তীরে গয়াক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের অক্ষয় শান্তিকামনায় পিণ্ডদান করলে আত্মার তুষ্টি হয়।

সম্পূর্ণ গয়াকৃত্যকে 'খাপরেল' বলে। খাপরেল শ্রাদ্ধে ১৭ দিন সময় লাগে। সকলের শক্তি, অর্থ ও সময়ে কুলোয় না বলে সংক্ষিপ্ত গয়াকৃত্য বিধি আছে। প্রথমে ফল্গুতীরে, তারপর বিষ্ণু মন্দিরের শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে ও শেষে অক্ষয়বটে পিণ্ড অর্পণ করতে হয়। প্রাচীনকালে গয়ায় পিণ্ডদান করতে এক বছর সময় লাগতো। প্রতিদিন একটি করে ৩৬০টি জায়গায় পিণ্ড দিতে হতো। কালের নিয়মে সেই বেদি ৫৪-তে এসে দাঁড়িয়েছে। গয়ালি ব্রাহ্মণরা যদিও ৪৫টি বেদির হদিশ পেয়েছেন।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ৫৪টি পিণ্ডদানের স্থান বেদির নাম উল্লেখ করছি। (১) পুনপুনপাদ (২) ফল্গুনদী, (৩) ব্রহ্মকুণ্ড, (৪) প্রেতশিলা, (৫) রামশিলা, (৬) রামকুণ্ড, (৭) কাকবলি, (৮) উত্তরমানস, (৯) উদীচী, (১০) কনখল, (১১) দক্ষিণমানস, (১২) জিহ্বালোল, (১৩) গদাধরজিউ, (১৪) সরস্বতী, (১৫) মাতঙ্গবাণী, (১৬) ধর্মারণ্য, (১৭) বোধগয়া, (১৮) ব্রহ্মসরোবর, (১৯) কাকবলি, (২০) রুদ্রপদ, (২১) বিষ্ণুপদ, (২২) ব্রহ্মপদ, (২৩) কার্তিকপদ, (২৪) দক্ষিণাগ্নি, (২৫) আহপত্যাগ্নি, (২৬) আহবাগ্নি, (২৭) সূর্যপদ, (২৮) চন্দ্রপদ, (২৯) গণেশপদ, (৩০) সামাগ্নিপদ, (৩১) অবসন্ধ্যাগ্নিপদ, (৩২) দধীচিপদ, (৩৩) কর্মপদ, (৩৪) মাতঙ্গপদ, (৩৫) ক্রৌঞ্চপদ, (৩৬) ইন্দ্রপদ, (৩৭) অগস্ত্যপদ, (৩৮) কাশ্যপপদ, (৩৯) গজকর্ণকার তর্পণ, (৪০) সীতাকুণ্ড, (৪১) রামগয়া, (৪২) সৌভাগ্যদান, (৪৩) গয়াশির, (৪৪) গয়াকূপ, (৪৫) মুণ্ডপৃষ্ঠা বেদি, (৪৬) আদিগয়া, (৪৭) ধৌতপদ, (৪৮) ভীমগয়া, (৪৯) গো প্রচার, (৫০) গদালোল, (৫১) দগ্ধ তর্পণ, দীপ, (৫২) বৈতরণী, (৫৩) অক্ষয়বট, (৫৪) গায়ত্রীঘাট।

গয়ায় পিণ্ডদান শুরু হয় পুনপুন নদীতে। জনশ্রুতি, পুনপুন নামে এক নর্তকী ছিল। সে নাচগান পরিবেশন করে পুরুষদের মনোরঞ্জন করতো। কিন্তু সূর্যদেব ও নারায়ণের পুজো করতো। জীবনের

শেষলগ্নে নর্তকী পুনপুন ভাবলো, এতকাল তো পাপ কাজে সময় কাটালাম। এরপর কী হবে! দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হল। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু জানালেন পুনপুন সারাজীবন সূর্য ও বিষ্ণুর পূজা করেছে বলে সে অমর থাকবে। গয়াতীর্থযাত্রীরা গয়ায় এসে প্রথমে পুনপুন নদীতে পিণ্ড অর্পণ করেন।

পুনপুনের পর ফল্গুনদীতে, তারপর প্রেতশিলার ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও ব্রহ্মার পদচিহ্ন কুণ্ডে পিণ্ডদান করা বিধি। প্রেতাত্মাদের সম্ভাবিত প্রেতত্ব নাশ ও শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় প্রেতশিলায় কাজ করতে হয়। স্বেচ্ছামৃত্যু ও অপঘাতে মৃত্যু হলে প্রেতশিলায় অবশ্যই কাজ করতে হবে। রামশিলায় পিণ্ডদান করে একটি নতুন মাটির হাঁড়ি ভাঙতে হয়। এটা লৌকিক আচার। রামকুণ্ড ও কাকবলির স্থানে পিণ্ডদান পর্ব মিটলে গয়ার পঞ্চতীর্থে যেতে হয়। উত্তরমানস, উদীচী, কনখল, দক্ষিণমানস, জিহ্বালোল হলো পঞ্চতীর্থ। জিহ্বালোল রয়েছে ফল্গু তীরে। ফল্গু তীরে নেমে ফল্গুজলে স্নান করতে হয়।

'ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে ক্যরামি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তি-মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে ॥'

গদাধর তীর্থে চতুর্ভূজ কষ্টিপাথরের গদাধর মূর্তি দর্শন করতে হয়।

বুদ্ধগয়ার কাছে ধর্মারণ্য। সেখানে রয়েছে মাতঙ্গবাণী। স্নান, তর্পণ সেরে সর্বপাপ বিশুদ্ধি কামনায়, পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করতে হয়। বুদ্ধগয়ার বিপরীতে, ফল্গুর অপর পাড়ে সরস্বতী এবং বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি বৃক্ষের প্রতি প্রণাম সেরে গয়ার ব্রহ্মসরোবর ও কাকবলিতে যেতে হয়। ধর্মারণ্যের বর্তমান নাম সুজাতা গড়।

শ্রীবিষ্ণুমন্দির চত্বরে ষোড়শবেদি আছে। এখানে দেবতা ও ঋষিরা নিজের নিজের পায়ের চিহ্ন লক্ষ করে সর্বকাল ধরে অবস্থান করছেন। ষোড়শবেদির কাছে একটি সূর্যঘড়ি আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কশ্যপ পদের যেকোনো একটি পদে শ্রাদ্ধ শুরু করতে হয়। তারপর যেকোনো পদে কাজ করা যায়। কিন্তু সবশেষে, প্রথমে যে পদে শ্রাদ্ধ শুরু হয়েছিলো, সেই পদে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান করতে হয়। তবেই পাদগয়া (ষোড়শবেদি) শ্রাদ্ধে শ্রেয়োলাভ সম্ভব।

রুদ্রপদে শ্রাদ্ধ করলে শতকুলের সঙ্গে শিবপুর প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মপদে ব্রহ্মলোক, দক্ষিণাগ্নিপদে নিজের বাজপেয় যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি হয়। গার্হপত্যপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, আহ্বানীয় পদে রাজসূয় যজ্ঞফল, সত্যাগ্নি পদে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞফল, আবসথ্যাগ্নিপদে সোমলোক প্রাপ্তি, সূর্যপদে পাঁচ'শ কুলের সূর্যপুর প্রাপ্তি, কার্তিকোপদে পিতৃলোকের শিবপুর প্রাপ্তি, ইন্দ্রপদে ইন্দ্রলোক, অগস্ত্য, চন্দ্র, গণেশ ও কশ্যপ পদে পিতৃলোকের ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি হয়। গজকর্ণিকাপদে জল তর্পণে পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ষোড়শবেদি শ্রাদ্ধের শেষে বিষ্ণু মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নরসিংহ ও বামন দেবমূর্তিকে দর্শন, প্রণাম, পূজা করলে পিতৃমুক্তি ঘটে।

বিষ্ণুমন্দিরের অপর পাড়ে সীতাকুণ্ড। অঞ্চলটির নাম রামগয়া। এখানে শ্রীরামচন্দ্র, হনুমানজির পায়ের ছাপ আছে। দশরথের 'হাত' মন্দির আছে। এই সেই স্থান যেখানে রাজা দশরথ পুত্রবধূ সীতার হাত থেকে বালির পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। এখানে বালির পিণ্ড দিয়ে শ্রাদ্ধ হয়। রামগয়ায় বালির পিণ্ড 'ত্রিপিণ্ড' নামে খ্যাত। পিণ্ডদান করতে হয় জমিতে, ভূমিতে ও পৃথিবীতে। রামসীতা মন্দিরে বালির গিঁট দিয়ে পিণ্ড দেয়া রীতি।

আদিগয়া গয়ার প্রাচীনতম স্থান। গয়াসুরের মাথা যেখানে রয়েছে সেই গয়াশিরে এবং গয়াকূপে পিণ্ড দিতে হয়। গয়াকূপে অশ্বত্থ গাছের তলায় পিণ্ডদান পর্ব চলে। আদিগয়ায় মুণ্ডপৃষ্ঠা বেদিতে 'ধ্রুপদ' বা ধৌতপদে পিণ্ডদান হয়। এখানে চাঁদি-রুপো দান করতে হয়। স্বর্ণদান এখানে হয় না। মঙ্গলাগৌরীর পাশে ভীমগয়া। ভীমের হাঁটুর চাপে যে পাথরটি বসে গিয়েছিল সেই পাথরে পিণ্ডদান হয়। সতীর একান্নপীটের এক পীঠ মা মঙ্গলাগৌরীর দক্ষিণে 'গো প্রচার'। এখানে পিতৃগণের মুক্তিকামনায় পিণ্ড দেয়া হয়। এই স্থলে গরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। কথিত আছে, ব্রহ্মা গোপ্রচারে গোদান করেছিলেন। অক্ষয়বটের দক্ষিণে 'গদালোল' তীর্থে গদাধর মূর্তি ও স্তম্ভরূপ এক গদা রয়েছে। এখানেও পিণ্ড দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থে পিণ্ডদান নেই। এখানে গোদান ও তর্পণ হয়। শেষে অক্ষয়বটে পিণ্ডদানের পর গয়ালি পাণ্ডাদের সুফল দান করে গয়াশ্রাদ্ধের সমাপ্তি হয়। গায়ত্রীঘাটে ফল্গুর তীরে পিণ্ড বিসর্জন দিলে পুত্রের পিতৃ-মাতৃকর্ম সম্পন্ন হয়।

আগেই বলেছি, মূলত সময়ের কারণে গয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত গয়াকৃত্যবিধি চালু আছে। মায়ের কাজ করতে গিয়ে আমিও সেই সংক্ষিপ্ত বিধিই অনুসরণ করেছিলাম। প্রথম দিন ফল্গুতীর্থ জিহ্বালোল তীর্থে, দ্বিতীয় দিন প্রেতশিলায়, বিষ্ণু মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে ও অক্ষয়বটে পিণ্ডদান করেছিলাম। ফল্গুতীরে সময় লাগে প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা। আমার পুরোহিত শ্রীগোবিন্দদাস ভট্টাচার্য, বাচ্চুবাবু নামে যিনি সমধিক পরিচিত, আমাকে ফল্গুতীর্থে নিয়ে গিয়ে মাতৃপিণ্ড দানের পুণ্য কর্তব্যটুকু যথাযথ সম্মানের সাথে করিয়েছিলেন।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ যেমন হয়, দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ, যমতর্পণ, পিতৃকুল, মাতৃকুলের মৃত আত্মীয়দের প্রতি সপিণ্ড, সতিল জলাঞ্জলি অর্পণ, ভীষ্মতর্পণ, সামান্য তর্পণ, রাম-লক্ষ্মণ তর্পণ এবং শেষে পিণ্ডদান। দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায় মাতৃষোড়শী উচ্চারণ। অকালপ্রয়াতা মায়ের গৌরবর্ণ। মুখটি মনে পড়ল। মা বেঁচে থাকতে তো মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। হয়তো কটু কথা বলেছি। হয়তো মায়ের মর্ম-ই বুঝিনি। আজ বুঝছি। সময় গিয়েছে চলে পাক্কা পনেরোটি বছর। মা নেই।

দশ মাস দশ দিন মা আমাকে গর্ভে ধারণ করে যে অশেষ কষ্টভোগ করেছেন, আমি গর্ভে আমার মা যে অসম পথে হাঁটতে কষ্ট পেয়েছেন। মাঘী ঠাণ্ডায়, গ্রীষ্মের ভয়াবহ রোদে মায়ের নিদারুণ কষ্টের নিস্তারের জন্য পিণ্ডদান করলাম। যখন গর্ভে ছিলাম, আমার পদসঞ্চালনে মায়ের কষ্ট হতো, আমার জন্মের পর মূত্র ও বিষ্ঠায় মায়ের জীর্ণ বস্ত্রাদি ভিজিয়ে দিয়েছি, দিনের পর দিন মা আমাকে স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়েছেন, আমার শরীর খারাপে মা রাতদিন জেগে কাটিয়েছেন, গর্ভবাসকালে, প্রসবকালে মায়ের অতীব কষ্টের কথা একটি একটি করে শ্লোকে স্মরণ করছি। আর যবের পিণ্ড মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। শ্লোক উচ্চারণ করব কী! চোখে

বারিধারা। মুখে অব্যক্ত অনুভূতি! আমার অসম আচরণে মা তো কোনোদিন রাগেননি। আমার সর্বংসহা, সদাহাস্যময়ী মা যেন যমদ্বারে মহাঘোরে কোনো কষ্ট না পান সেজন্যই অধম পুত্রের এই পিণ্ডদান।

ফল্গুতীরের উৎসর্গ করা পিণ্ড ফল্গুর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বৃষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল।

পরদিন প্রেতশিলায় ব্রহ্মকুণ্ড থেকে জল নিয়ে ৫৫০ ফুট উঁচু পর্বত শিখরে উঠলাম। ৬৭৬টি সিঁড়ি ভেঙে প্রেতশিলায় ব্রহ্মার পদচিহ্ন কুণ্ডে পৌঁছে পিতৃ-মাতৃকুল ও মায়ের পিণ্ডদান করলাম। প্রেত পর্বতে এক ভয়ংকর-দর্শনা কালীমূর্তি ও কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি আছে। প্রেতশিলা থেকে ফিরে এলাম ফল্গুতীরে অবস্থিত বিষ্ণুমন্দিরে।

কালো পাথরের বিষ্ণুমন্দিরটি ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সোনার কলস, সোনার পতাকা রয়েছে মন্দিরের শীর্ষে। আট কোণ বিশিষ্ট এক গহ্বরে শ্রীবিষ্ণুর পায়ের ছাপের ওপর এক-এক করে পিণ্ড উৎসর্গ করলাম।

গয়ার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষ্ণুপদ। আট সারি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত মন্দিরের প্রত্যেকটি স্তম্ভ চারটি স্তম্ভের সমষ্টি। মন্দিরের শীর্ষাংশ গম্বুজাকার। এই মন্দিরের ভেতরেই ১৩ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি বিস্তৃত প্রস্তর ফলকের ওপর রুপো দিয়ে তৈরি ষোলোটি কোণ বিশিষ্ট কুণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের অবস্থান। পদচিহ্নে দুধ ঢাললে বিষ্ণুপদ স্পষ্ট হয়। ভক্ত, তীর্থযাত্রীদের কাছে এই বিষ্ণুপদ-ই পরম আরাধ্য। এখানে পিণ্ডদানেই পিতৃপুরুষের মৃত আত্মার শান্তি হয়।

বিষ্ণুমন্দির সংলগ্ন গদাধর মন্দির, পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির, সাক্ষীগোপাল, বাসনী দেবী, ললিতা দেবীর মন্দির দেখা দরকার। 'গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী' দেবী গয়ার অভিভাবিকা দেবী। নৃসিংহ, জগন্নাথ, পঞ্চগণেশ, অহল্যা মন্দির, বরাহ মন্দির দেখে পৌঁছে গেলাম অক্ষয়বটে।

সীতার আশীর্বাদে অক্ষয়বট গয়ায় চিরজীবী ও অমর। শ্রীরামচন্দ্র ফল্গুতীরে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গেছেন। একটু বেরিয়েছেন শ্রাদ্ধের সামগ্রী আনার জন্য। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বলে দশরথ নিজে এসে পুত্রবধূ সীতার হাত থেকে ফল্গুর বালির পিণ্ড নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। রামচন্দ্র এসে শুনলেন সীতার হাতে শ্বশুরের পিণ্ডগ্রহণের কথা।

রামচন্দ্র অবিশ্বাস করলেন। এ আবার হয় নাকি। সাক্ষী ছিল তুলসী, ফল্গুনদী, ব্রাহ্মণ ও বটবৃক্ষ। তুলসীগাছ, ফল্গুনদী, ব্রাহ্মণ সীতার সপক্ষে একটি কথাও বললেন না। সীতা তাই অভিশাপ দিলেন। অপবিত্র স্থানে তুলসীগাছ জন্মাবে। তার গায়ে 'শৃগাল-কুক্কুর মূত্র-পুরীষ ত্যজিবে'। ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হবে। কুকুর-শিয়াল ফল্গুকে ডিঙিয়ে চলে যাবে। আর ব্রাহ্মণের ঘরে পর্যাপ্ত টাকা থাকলেও সে দেশ-দেশান্তরে ভিক্ষা করতে যাবে।

সাক্ষী দিয়েছিল বটবৃক্ষ। সীতার মান রক্ষা করেছিল। বটবৃক্ষ বলল, 'বালি পিণ্ড লয়েছিলো সীতা ডান হাতে।/ আপনি লইলা তাহা রাজা দশরথে।' কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণে এমন কথাই লিখেছেন। সেই বটবৃক্ষ সীতার সময় থেকে অমর, অক্ষয়। শীতকালে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল। অক্ষয়বটের শাখা সীতার আশীর্বাদে কখনো নিষ্পত্র হয় না।

অক্ষয়বটের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান পর্ব শেষ করে গয়ালি পাণ্ডা, ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়। ময়দার পুরী, তরকারি ও প্যাঁড়া-ই হল খাদ্যতালিকা। অক্ষয়বট থেকে নামার সময় এবং বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের পর তীর্থ পুরোহিত গয়ালি পাণ্ডার কাছ থেকে সুফল নিতে হয়। 'সুফল' ছাড়া গয়া-কাজ সফল হয় না। গয়ালি পাণ্ডা পিণ্ডদানকারীর পিঠ স্পর্শ করে 'সুফল' বলেন। অর্থাৎ যিনি গয়ায় গয়াকৃত্যের জন্য এসেছেন তাঁর গয়াকর্ম যথাযথরূপে সম্পন্ন হয়েছে। অক্ষয়বট থেকে নামার সময় অপেক্ষমান ভিখারিকে কিছু অর্থ অথবা চাল দিলে পুণ্য হয়।

গয়ার পাণ্ডাদের 'গয়ালি' বলে। একসময় গয়াকৃত্য ও তীর্থ করতে আসা যাত্রীরা গয়ালি পাণ্ডাদের বাড়িতে আশ্রয় নিত। পাণ্ডাদের হাতে তীর্থযাত্রীরা অত্যাচারিত, নিপীড়িত হত। পাণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে অনেকেই গয়ার নাম শুনে আতঙ্কিত হন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ ভারতবর্ষের তীর্থ সংস্কারে মন দিয়ে প্রথমেই গয়াতীর্থ সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন, কারণ একসময় পিতার পিণ্ডদান করতে এসে তিনি নিজে গয়ায় পাণ্ডাদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গয়ায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে যাত্রীদের সেবা-সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামী প্রণবানন্দ গয়াতীর্থের পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। স্বামীজির সাংগঠনিক কৌশলের কাছে পাণ্ডাদের বাধা-বিপত্তি, ভয় দেখানো বৃত্তি পরাভূত হয়েছে।

স্বরাজ্য পুরী রোডে গয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ অবস্থিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ফটকের দু'পাশে ওপরে সিংহমূর্তি আছে। এই সিংহদ্বার দেখলেই নিশ্চিত বুঝতে পারবেন আপনি প্রকৃত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পৌঁছে গেছেন। গয়া স্টেশনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা খোলা আছে। সেখানে তীর্থযাত্রীরা যোগাযোগ করলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সবরকম সাহায্য করার জন্য নিবেদিত। স্বরাজ্যপুরী রোডে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পৌঁছে প্রধান মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আপনাকে একটি হলুদ রঙের কার্ড দেবেন। সেই কার্ডে আপনার নাম, ঘরের নম্বর এবং আপনারা কতজন এসেছেন তা লিখতে হবে। পিণ্ডদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা

সকাল ৬:৩০-এর মধ্যে স্নান সেরে হলুদ কার্ড নিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন। আপনি কত টাকায় পিণ্ডদান কর্ম করবেন তা জানালেই প্রধান মহারাজ পূজারির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে দেবেন। আত্মার কোনো দোষ কাটানো বা প্রেতশিলায় কাজ করতে হলেও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান মহারাজের কাছে পরিষ্কার বলে দেবেন। না হলে পিণ্ডদান স্থলে আপনি অসুবিধায় পড়বেন।

১৯৩৭ সালে বাঙালি-বিহারি প্রাদেশিকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বিহারি পাণ্ডারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কোনো নির্দেশ মানবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। গয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে তীর্থকৃত্য উদ্দেশ্যে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের পিণ্ডদানে পাণ্ডারা বাধার সৃষ্টি করল। স্বামী প্রণবানন্দ খবর পেয়ে গয়ায় এলেন। আলাপ-আলোচনা নিস্ফল হল। তিনি তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ভট্টাচার্য পুরোহিতকে সঙ্গে করে ফল্গুঘাটে উপস্থিত হলেন। স্বামী যুক্তানন্দ লিখেছেন, 'পাণ্ডারা ঘোষণা করেছিল, সেবাশ্রমের কোনো লোক ফল্গুঘাটে বা বিষ্ণুমন্দিরে এলে মাথা নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।' অথচ তাদের এই স্পর্ধিত ঘোষণা উপেক্ষা করে সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে পুরোহিত ও তীর্থযাত্রীরা ফল্গুঘাটে সাহস করে আসবে পাণ্ডারা একথা ভাবতেও পারেনি। স্বামী যুক্তানন্দের ভাষায়, 'তাই সন্ন্যাসী সব পুরোহিত ও যাত্রীদের দেখে তারা খেপে গিয়ে ঘিরে ধরে তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল। পুরোহিতকে ভয় দেখালো, 'ভটচাজ্, তুমহারা খুনমে ফল্গু ভাস যায় গা!' একইভাবে সন্ন্যাসীকেও তারা নানারকম ভয় দেখালো, গালাগাল করলো। কিন্তু অন্যপক্ষের সবাই নির্বাক। পাণ্ডারা যতখানি ভয় দেখিয়েছিল ততখানিই বিস্মিত হলো স্বামী প্রণবানন্দ, পুরোহিত ভট্চাজও তীর্থযাত্রীদের সাহসের পরিচয় পেয়ে।

পুরোহিত ভট্চাজ হলেন সন্তুবাবু ওরফে ঁগুরুদাস ভট্টাচার্য। তাঁরই পুত্র আমার তীর্থ-পুরোহিত শ্রীগোবিন্দদাস ভট্টাচার্য। শ্রাদ্ধাচার্য তাঁর উপাধি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঠিকানা– স্বরাজ্যপুরী রোড, গয়া, বিহার পিন-৮২৩০০১, দূরাভাষঃ (০৬৩১) ২২২০৫৭৯, ২২২৬০২১, গয়া স্টেশনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা কার্যালয়ের দূরাভাষঃ (০৬৩১) ২২২০৯২৯, সঙ্ঘের কলকাতার ঠিকানা– ২১১, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৯, দূরাভাষঃ (০৩৩) ২৪৪০৫১৭৮। অবশ্যই দূরাভাষে যোগাযোগ করে গয়া যাবেন।

শ্রীগোবিন্দদাস ভট্টাচার্যের ঠিকানা স্বর্গীয় গুরুদাস ভট্টাচার্য (সন্তুবাবু)-এর বাড়ি, বামনিঘাট, গয়া, বিহার, পিনকোড-৮২৩০০১, দূরাভাষঃ (০৬৩১) ২২২১৯২৭ (বাড়ি), চলভাষঃ ০৯৪৩০৬০৮৪২৭।

অনেকবার গয়া গিয়েছি। গয়া স্টেশনে নেমে একবার আমি প্রায় প্রতারিত হচ্ছিলাম। সঠিক সময়ে পরিচিত একজন স্টেশনে আমাদের নিতে চলে আসায় সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেছি। তাই বলি, কখনো দালালদের খপ্পরে পড়বেন না।

শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিণ্ডদান করতে গিয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আপ্লুত হন। শ্রীবিষ্ণুর চরণ দর্শন করে নদীয়ার নবদ্বীপের নিমাই নতুন মানুষে পরিবর্তিত হন। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত'-এ লিখেছেন, 'অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।/ রোম হর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥' গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপিণ্ড অর্পণ করে মহাপ্রভুর জীবনপ্রবাহ বদলে যায়। গয়াতেই তিনি পরিচিত হন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে। সাধক ঈশ্বরপুরী জানতেন গৌরাঙ্গ ঈশ্বরেরই অংশ। তাঁর চিনতে ভুল হয়নি। দশাক্ষর মন্ত্রে, গয়াতে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষিত হন শ্রীগৌরাঙ্গ দেব।

কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়ায় বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করে রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর সামনে শ্রীগদাধর এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমি তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে জন্মাবো। কে না জানে এই পুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবরদাস বাবাজির আশ্রমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধনভজন করতেন। এই নির্জন পাহাড় রঘুবরদাসের কাছে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আত্মনিবেদনের সাক্ষী। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের কপিলধারায় যোগীরাজ গম্ভীরনাথ বাবা যোগাসন প্রতিষ্ঠা করে তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন।

আর স্বামী প্রণবানন্দ তো গয়াকে কেন্দ্রে রেখেই তাঁর ভারতবর্ষীয় তীর্থ সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে গয়াশ্রাদ্ধ ত্রিলোক দুর্লভ হয়। পিতৃপক্ষে, মহালয়ায় গয়াক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের পিণ্ডদানের জন্য লাখ লাখ মানুষ আসেন। গয়াতীর্থে যেকোনো দিনেই পিণ্ডদান চলে। পূর্বপুরুষেরা উত্তর পুরুষের পিণ্ডদানের অপেক্ষায় থাকেন।

আত্মার পরলোক যাত্রা ও পারলৌকিক ক্রিয়া

দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)

এ জগতে ঈশ্বরবিশ্বাসী সকল মানুষের মধ্যে সনাতন ধর্মে আস্থাশীল ভারতবাসীগণই কেবল আত্মার নিত্যতা আর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ গীতা দৃঢ়বদ্ধভাবেই এর প্রমাণ বহন করেছে। পুরানো জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র ধারণ করে, তেমন জীবাত্মাও জন্মজন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্মানুসারে পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন দেহে প্রবেশ করে। জীবাত্মার পঞ্চভৌমিক শরীর ত্যাগের ঘটনাই মৃত্যু আর নতুন শরীর গ্রহণ করার নামই জন্ম। এই জন্ম-মৃত্যু চক্রের ধারাবাহিকতার নামই সংসার। সংসারে কারো প্রিয়জন বিয়োগ হলে শোক আর জন্ম হলে আনন্দ। জন্ম আর মৃত্যুর হর্ষবিষাদের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্যেও ঘটেছে শাস্ত্রের অনুপ্রবেশ। ব্যক্তির মৃত্যুতে রয়েছে মরণাশৌচ আর জন্মে রয়েছে আনন্দাশৌচ।

যে মানুষটা দীর্ঘদিনের সুখদুঃখের সাথী দীর্ঘকাল একসঙ্গে একই ছাদের নিচে বাস করা, সুখদুঃখের হরেক অনুভূতির সঙ্গী হওয়া– সেই প্রিয়জনটির পঞ্চভৌতিক শরীর পাতের সঙ্গে সঙ্গেই কি ঘুচে যায়– শেষ হয়ে যায় সব সম্পর্ক? না! তা হতে পারে না। বিশুদ্ধ মানবনীতি-ধর্ম ও সংস্কার এক নিমেষে সবকিছু শেষ হতে দেয় না। প্রিয়জনের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-আন্তরিকতা বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত কৃতকর্মটিই শ্রাদ্ধ। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মৃতের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার নিরিখে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনই অশৌচ। সুসংযত জীবনযাপন– অবশেষে অশৌচান্তে আর্থিক

আনুকূল্যে বিদেহী প্রিয়জনটির সঠিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় বিধি বিধান অনুসারে খাদ্য পানীয় বস্ত্র শয্যা পাদুকা তৈজসসহ শ্রাদ্ধকর্মানুষ্ঠান। মৃত আত্মা যদিও অন্ন পানীয় বস্ত্র শয্যা তৈজস কিছুই গ্রহণ করে না তবুও তার প্রতি নিবেদিত সামগ্রী অন্তরের শ্রদ্ধার পথ ধরে অতি সূক্ষ্মভাবে বিদেহীর পরলোক যাত্রাপথে অথবা আত্মার নতুন দেহ ধারণের পরেও তৃপ্তি শান্তি আর আনন্দ বিধান করে। তবে যেটা চাই, সেটা হল শ্রদ্ধা। সমস্ত কর্মের মূলেই রয়েছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ বহু অর্থব্যয়ে করা হলেও শুধু আড়ম্বর মাত্র– নিষ্ফল।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
পার্বণঞ্চেতি মনুনা শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥

মনু মহারাজের উক্তি অনুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য বৃদ্ধি এবং পার্বণ এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধ পদ্ধতি রয়েছে। মহাজনেদের শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় বিচার-বিশ্লেষণ থেকে এটা সাব্যস্ত যে, কেবল পিতৃপুরুষের উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রাদ্ধকর্ম কর্তব্য নয়। পিতৃপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধকারী মানুষটিও তরে যায় পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে। যদি এমনটাই না হবে তবে সেই কোন পুরাণকাল থেকে সমাজের বুকে এই শ্রাদ্ধবিধি অনুসৃত হয়ে আসছেই বা কেন...? শোনা যায়, সীতাদেবীও নাকি রাজা দশরথের বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ডদান করতে হাজির হয়েছিলেন গয়াধামের প্রেতশিলায় বিষ্ণু পাদপদ্মে। ফল্গু নদীর বালুকারাশি একত্রিত করে পিণ্ড নির্মাণ করে তা উৎসর্গ করেছিলেন। এমনও প্রচার আছে রাজা দশরথ স্বয়ং হস্তপ্রসারিত করে সেই পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেব উত্তরায়ণে মরশরীর ত্যাগ করার পর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে শ্রাদ্ধ পিণ্ড চেয়েছিলেন। পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যুধিষ্ঠির পিণ্ডদানে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিরস্ত করেন। কারণ প্রেতের পক্ষে শুধুমাত্র কুশব্রাহ্মণেই শ্রাদ্ধপিণ্ড গ্রহণ করা সম্ভব। এমনটাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ– পিতামহ ভীষ্ম যেন প্রতীক্ষায় থাকেন উৎসর্গীকৃত পিণ্ড দর্ভব্রাহ্মণের মাধ্যমে গ্রহণ করার জন্য।

তবে শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানার আগে একটা বিষয় বিশেষভাবে জানা আবশ্যক তা হল বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব-অবস্থান ও গতি। এর উপরেই অনেকটা নির্ভর করছে শ্রাদ্ধীয় বিধি-বিধান।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন– যুক্তচেতা ভক্ত কখনো ভগবানকে ভোলে না। প্রয়াণকালে মৃত্যুর ভয়প্রদ ভীষণ বিভীষিকার সামনেও ইষ্টকেই ডাকে। ভগবানকেই স্মরণ করে। এই স্মরণের ফলে 'মদ্ভাবং যাস্তি' ভক্ত ভগবানের স্বরূপই প্রাপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল... কেবলমাত্র মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মরণে থাকলেই কি ভগবত ভাব পাওয়া যায়? আশ্চর্য কথা। সারাজীবন ঈশ্বর বহিঃমুখ থেকে শেষটায় একটু ভগবানকে ডাকলেই হল! তবে তো ওই কৌশলটা জেনে নিলেই হয়। তাহলে অনেকেই জীবনভর যথেচ্ছ আচরণ করে শেষকালে ভগবান চিন্তা করে পরমগতি লাভ করতে পারে।

আসলে তা নয়– এর যথার্থ উত্তরটাও রয়েছে গীতাতেই। সারাজীবন যথেচ্ছভাবে কাটালে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণ একটা উক্তি করেছেন– সদা তদ্ভাবভাবিতঃ– মরণের সময় যাতে স্মরণে আসে সেই জন্যে সারাটা জীবনই ঈশ্বর স্মরণে থাকতে হয়। বলেছেন– 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যঃ চ'– সর্ব অবস্থাতেই আমার স্মরণ করতে করতেই যুদ্ধ কর– সংসার যুদ্ধে নিয়োজিত থাক।

নীতিশাস্ত্রে রয়েছে– 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ'– যমরাজ যেন চুলের মুঠি ধরে আছেন– এমনটা ভাবতে ভাবতেই ধর্মাচরণ করতে হয়। জীবনটাই যেন মৃত্যুর প্রস্তুতি– এ ভাবটাই জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

প্রিয় সখা অর্জুনকে বলে চলেছেন কেশব সেই পরম পথের কৌশল যোগীরা যাঁকে পেতে অনুভবে ডুবে যায়। তপস্বী অবলম্বন করে কঠোর ব্রহ্মচর্য। অক্ষর ব্রহ্মভাবে মগ্ন হয় বেদজ্ঞ। অনন্যচিত্ত ভক্ত নিরন্তর অনুচিন্তনে সমাহিত হয়। এভাবেই যে যার ধারায় সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে প্রাণশক্তি ভ্রু-মধ্যে কেন্দ্রিত করে হৃদয়ে ধ্যান করে মুখে প্রণবধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে অবশ্যই সেই ব্যক্তি পরমগতি লাভ করবে। শুধু একদিন নয়– সারাটা জীবন ধরে প্রত্যেকটা দিন এই অভ্যাসে বদ্ধমূল থাকতে পারলেই কেবল এই আশা বা ভরসা থাকে যে মৃত্যুকালে 'তদ্ভাবভাবিতঃ' অবস্থা লাভ করা সম্ভব।

সপ্তধাতু বিশিষ্ট মনুষ্য শরীর–

রসাসৃক্‌মাংসমেদোঽস্থি মজ্জা শুক্রানি ধাতবঃ–রস রক্তমাংসমেদো অস্থি মজ্জা শুক্র– এই সপ্তধাতুময় মানুষের শরীর। সাতরকম ধাতুর মধ্যে শুক্র থেকেই পুত্র-পৌত্রাদির নতুন শরীর তৈরি হয়। শুক্রধাতু সৌম্য প্রাণযুক্ত। সৌম্যপ্রাণরূপ পিতর থেকেই জীবের শরীর গ্রহণ। এই সৌম্যপ্রাণ প্রধান পিতর বা পিতৃগণের গতি চন্দ্রমণ্ডল বা তার আশপাশের লোক।

হরিবংশ পুরাণে পিতৃকল্প আরম্ভের একটা আখ্যায়িকা রয়েছে– সেটা জানা দরকার। কোনো এক সময় দেবতারা বেদ ভুলে যান। সেই বিষয়কে উপলক্ষ্য করে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে হাজির হন দেবগণ। এ সমস্যার সমাধানে বিধান দেন ব্রহ্মা– দেবতারা যেন তাঁদের পুত্রদের কাছ থেকেই পড়ে নেন বেদ। দেবতাদের পুত্ররা সকলেই এক একজন বেদবিদ্বান। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে তাই করেন দেবতারা। বেদাধ্যয়ন শেষ হলে দেবতাদের পুত্ররা যে যার

পিতাকে বলে– যাও পুত্র, তোমার বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। নিজ নিজ পুত্রমুখে 'পুত্র' সম্বোধন শুনে অত্যন্ত রেগে দেবতারা হাজির হন প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে আর নিবেদন করেন পুত্রদের অমর্যাদাপূর্ণ আচরণের কথা। দেবতাদের নালিশের জবাবে জানান ব্রহ্মা– পুত্ররা ঠিকই বলেছে। কারণ জ্ঞান প্রদাতা সর্বদাই পিতা আর জ্ঞান গ্রহীতা পুত্র। যেহেতু তোমরা পুত্রদের কাছ থেকে বেদবিদ্যা অর্জন করেছো, তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা তোমাদের পিতা হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার এমন সিদ্ধান্ত অনুসারেই দেবতাদের পুত্ররা 'পিতৃ' নামে প্রসিদ্ধ হলেন আর দেবতারা দেব নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

মৃত্যুর পর মরলোক থেকে পিতৃলোক এবং পুনরায় সেখান থেকে মরলোকে ফিরে আসা– এই আসা-যাওয়ার উপায় বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে গীতা। সামবেদ-ছান্দোগ্য উপনিষদ একটা পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে।

জীবের উৎক্রান্তির বিষয়ে গীতাকার বলেছেন দু'টি পথের কথা। এক পথে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। দ্বিতীয়টিতে গেলে ঘুরে আসতে হয়। প্রথমটি অনন্তে পৌঁছাবার সরলরেখা। অন্যটি বৃত্তাকার। সরলপথের অধিকারী সরলপথে পৌঁছে যায় অসীম অনন্তে– পুরুষোত্তমের লীলালোকে। সে ফিরে না বা ফিরতে বাধ্য হয় না। স্বেচ্ছায় এলো আসতে পারে জগতের জীবের কল্যাণ সাধন নিমিত্তে।

আর অন্যজন! বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে আবার সেই সংসারে। প্রকাণ্ড সে বৃত্ত। ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য বা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বৃত্তের বিস্তার।

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনঃ'– ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়েও আবার ফিরে আসা।

যারা জ্ঞান ভক্তি কর্মের পথে আত্মোন্নতির কামনা করে এই দুই পথ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট। আর যাদের আত্মোন্নতির চেষ্টা বিন্দুমাত্র থাকে না– তাদের জন্যে অন্ধকারময় এক পথের কথা বলেছে উপনিষদ– 'অর্সূয্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা'– ঘোর অন্ধকার পথেই তাদের পুনঃ পুনঃ যাতায়াত মনুষ্যেতর যোনিতে।

সামবেদ বা ছান্দোগ্য উপনিষদের পরিষ্কার ধারণায় মৃত্যুর পর তিন প্রকার গতির কথা বলা হয়েছে। অর্চিমার্গ, ধূমমার্গ আর বিনাশ মার্গ। অর্চিমার্গকে দেবযান ধূমমার্গকে পিতৃযান বলা হয়। মৃতের শরীর থেকে বেরিয়ে যেটা লোকান্তরে যাত্রা করে সেটা সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ আর মন ও বুদ্ধি এই সতেরোটি তত্ত্ব নিয়েই সূক্ষ্ম শরীর। আত্মা এই সূক্ষ্ম শরীর দ্বারাই বাহিত হয়।

মুখ্যত চন্দ্রলোকই পিতৃলোক। দিব্য পিতরৌগণের নিবাসস্থল। সূক্ষ্ম শরীর চন্দ্রমার আকর্ষণে পৌঁছায় চন্দ্রলোকে বা পিতৃলোকে। তবে সবটাই নির্ভর করে মনের গতির উপরে। চন্দ্র মনের অধিপতি। দেহমুখী মনের গতিতেই পিতৃলোকে যাত্রা। অনেক পথ ঘুরে পুনরায় নরদেহ প্রাপ্তি। গীতার ভাষায় 'কামকামাঃ'– ভোগমুখীরাই পিতৃযানে যাতায়াত করে।

আত্মার প্রতীক সূর্য। যারা তপস্বী যোগী বা উচ্চকোটির উপাসক তাদের বুদ্ধি বিজ্ঞানাত্মক। বিজ্ঞানী পুরুষ মনকে প্রবলভাবে অবদমিত করতে পারে। সম্পূর্ণ শুদ্ধবুদ্ধি তত্ত্বের দ্বারাই চালিত হয় তারা। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব সূর্যের অংশ। তাই বিজ্ঞানী পুরুষের উপর সূর্যের প্রবল আকর্ষণ ঘটে। ফলে সূর্যমণ্ডলেই গমন করে তারা। এই মার্গ বা পথকেই বলে দেবযান।

আর এক বিশেষ জীবকোটী রয়েছে– মনের অত্যন্ত নিম্নগতির কারণে তাদের যে পরিণতি হয় তাকে বলে বিনাশগতি। ঘর-বাড়ি, পশু-পাখি, স্ত্রী-পুত্রতেই যাদের আকর্ষণ অধিকমাত্রায় যারা ডুবে রয়েছে পার্থিব বস্তুতে, অত্যন্ত নিম্নবৃত্ত মন নিয়ে বার বার এই পৃথিবীতেই জন্মাতে থাকে তারা। একেই নিকৃষ্ট গতি বলে বেদ এবং ঋষিরা শনাক্ত করেছে।

যাই হোক, শাস্ত্র পুরাণে অনেক কথা থাকলেও যেটা সর্বতোভাবে সত্য বা বাস্তব এবং গ্রহণযোগ্য তা হল যে মানুষটার সঙ্গে দীর্ঘসময়ের একাত্মতা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়া এটা যেমন বেদনার, তেমনই অমানবিক। আমরা হিন্দুরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসী। দেহনিষ্ঠ আত্মার স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। যে আমাকে জন্ম দিল, জগৎ দেখাল, লালন-পালন করল তার স্থূল শরীরটা নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আমাদের সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আমি বা আপনি আমরা যে পরিবার বা বংশের উত্তরাধিকারী সেই পরিবারের মর্যাদা আর সংস্কার রক্ষা করাটা আমাদেরই কর্তব্য। তাই কয়েকটা দিন মাত্র সেই ব্যক্তিটির স্মৃতিচারণায় কালাতিপাত করা যায় বা শাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুসারে তার পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করা যায় সেটা খুব একটা যুক্তিহীন বলে মনে হয় না। পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্যে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গাকে আনয়ন করতে কত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কয়েক বিন্দু মাত্র গঙ্গাজলে পূর্বজদের তর্পণ বা স্মরণ আমরা করতেই পারি।

হিন্দুধর্মে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকেই শ্রাদ্ধ বলেছে। আত্মার মুক্তিতে শ্রাদ্ধ শাস্ত্র সমর্থিত রীতি। আত্মার পরলোক যাত্রায় শ্রাদ্ধকর্ম অবশ্যই করণীয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি অপরিহার্য ক্রিয়া।

শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা। আমরা যদি পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখি তবে সামাজিক ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে পরিবারকেন্দ্রিক সমাজে যেমন বিবাহ উপনয়ন মুখ্যান্নপ্রাশন জন্মতিথি ইত্যাদি নৈমিত্তিক কর্মের বিধান রয়েছে তেমন শ্রাদ্ধ কর্মকেও পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়েছে শাস্ত্র। এককথায় বলা যায়– মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দশ দশার প্রতিটি পর্যায়েই কোনো না কোনো সংস্কারের বিধান রয়েছে। পারলৌকিক কর্মকাণ্ডের পথই শ্রাদ্ধ। বরাহপুরাণে বলা আছে জগৎপূজ্যের পুজোতেও তর্পণের বিধান রয়েছে। নিত্যকর্ম করতে বসে ব্রাহ্মণরাও দেবতা ঋষি পিতৃতর্পণ করেন– দেবানস্তর্পয়ামি ঋষিনস্তর্পয়ামি, পিতৃনস্তর্পয়ামি– তর্পণ উদ্দিষ্ট জলের দ্বারা দেবতা ঋষি পিতরৌগণের তর্পণ শাস্ত্রস্বীকৃত। যমস্মৃতিতে বলা আছে– যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্মানুষ্ঠান করে এবং যে শ্রাদ্ধকর্মে সহায়তা করে তাদের সকলেরই শ্রাদ্ধকর্মের ফলপ্রাপ্তি ঘটে।

আত্মা বিদেহী হলে স্থূল শরীরটা পড়ে থাকে। পরম্পরা অনুসারে দেহটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়। একেই বলে শেষকৃত্য। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই স্থূল মরশরীরটা চিতায় রাখতে রাখতেই শুরু হয় পিণ্ডদান ক্রিয়া। বিশেষত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে একে ঘাটপিণ্ড বলে। আর তখন থেকেই শুরু হয় অশৌচ বিধি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই দেশ কাল পাত্র বিচার করে চলার স্বাধীনতা দিলেও কিন্তু অশৌচ পালন বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের দশ দিন। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন। বৈশ্যের পনেরো দিন। শূদ্রের এক মাস। শাস্ত্রের এমনই কঠোর নির্দেশ রয়েছে– জাতি অনুসারে অশৌচের ধার্যদিন কেউ যেন নিজের ইচ্ছায় হ্রাস না করে। এ বিষয়ে বিচক্ষণ পুরোহিত যজমানের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিধান দিলেই শুভ। শাস্ত্র এবং পূর্বপুরুষদের কথা লঙ্ঘন করে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করলে পাপান্বিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এতে পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তি বা তৃপ্তি হওয়া তো বহু দূরের কথা, শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘনের কারণে পুরোহিত ও যজমান উভয়েই পাপভাগী হতে পারেন। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন সেই সন্ন্যাসীকে অশৌচ ধারণ করতে হয় না– এমনটাই শাস্ত্রীয় বিধি।

মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত পিণ্ডই বিদেহী বা পিতৃপুরুষের আহার। সম্প্রদায় অনুসারে শ্রাদ্ধকর্তা যেমন যেমন তর্পণ দান করেন ভূতাত্মা তাতেই তৃপ্ত হন। পরলোকে হয়তো অনেক দিন পর্যন্ত কোনো কোনো আত্মাকে অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষমান আত্মার ততদিনই পিণ্ডের প্রতি আসক্তি থাকে।

আদ্যশ্রাদ্ধ ছাড়াও বছরে দু'বার শ্রাদ্ধকার্যের বিধান রয়েছে। একটি বাৎসরিক– যে তিথিতে পঞ্চভৌমিক শরীরের বিয়োগ ঘটেছে সেই তিথিটিতে আর দ্বিতীয়টি পিতৃপক্ষ, যাকে মহালয়া পার্বণ শ্রাদ্ধকাল বলে নির্দিষ্ট করেছে শাস্ত্র। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত। আবার মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতিথি স্মরণে না থাকলে অথবা কোনো কারণে তিথিটি এড়িয়ে গেলে তখন পরবর্তী অমাবস্যা তিথিটি গ্রহণ করা কর্তব্য।

যে ঋতুতে সোমতত্ত্ব প্রবল হয়ে অগ্নিতত্ত্বকে দাবিয়ে দেয় সেই ঋতুই পিতৃকার্যের অনুকূল। তাই শরৎ ঋতু পিতৃপক্ষ। পিতার বংশের তিন পুরুষ এবং মায়ের বংশের তিন পুরুষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করা হয়। পরলোকের প্রতীক্ষাকাল যত লম্বাই হোক না কেন তিন পুরুষের বেশি সময় লাগে না।

মহালয়ার পার্বণ শ্রাদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রে এমনটাও বলা হয়েছে– পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের আগমন ঘটে কুলব্রাহ্মণে এবং সূক্ষ্ম শরীরে সেইখান থেকেই তর্পণ গ্রহণ করে। পার্বণ শ্রাদ্ধকালে বিশেষত জল দানেরই বিধান রয়েছে। জলেই পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। পিতৃপুরুষের দেহে এককালে যে আত্মা অবস্থিত ছিল সেই আত্মা পরবর্তীকালে যে শরীরেই থাকুক না কেন তর্পণ জল শাস্ত্রীয় মন্ত্রবলে বর্তমান দেহের ভোগ্যবস্তুর পরমাণুর সঙ্গে মিশে যায়, যার দ্বারা আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ করে।

পার্বণ শ্রাদ্ধকালে শুধু পিতৃপুরুষেরই নয়, দেবতা-ঋষি দিব্যপিতরৌ এমনকি যমতর্পণেরও বিধান রয়েছে। এছাড়া– বৈয়াঘ্রপদ গোত্রায় সাংস্কৃতিপ্রবরায় চ অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে– এই মন্ত্রে অপুত্রক ভীষ্মদেবেরও তর্পণের বিধান রয়েছে। এছাড়াও ভূমিতে জল ফেলে শ্রাদ্ধকর্তার কুলস্থিত অপমৃত্যু ঘটেছে যে সমস্ত পুরুষের তাদেরও জল দেয়ার বিধান রয়েছে। এছাড়াও বস্ত্রসিক্ত জলদানের বিধানও রয়েছে। বিচিত্র শাস্ত্র বিধান। গয়ায় গিয়ে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদানের বিধান যেমন রয়েছে, তেমন পিতৃপক্ষের প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কালব্যাপী শ্রাদ্ধেরও বিধান রয়েছে। আবার রয়েছে ঐচ্ছিক শ্রাদ্ধ পিতামহ পিতামহী বা মাতামহ মাতামহীর শ্রাদ্ধ পৌত্র বা দৌহিত্র করার নিয়ম রয়েছে। অবিবাহিত মৃত পুত্র কন্যা বা ভাই ভগিনীর শ্রাদ্ধ পিতা বা অন্য ভাই করার বিধান রয়েছে। জ্যাঠা কাকা মামার বংশে যদি কেউ না থাকে তবে সেক্ষেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগনেও শ্রাদ্ধ করতে পারে। কোনো বংশে কোনো পুরুষ সদস্য না থাকলে কন্যাসন্তানই শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়।

আসলে আত্মার পরলোক যাত্রা থেকে পারলৌকিক ক্রিয়া– সবটাই যেন এক বিশেষ বিজ্ঞান। কোনো একজন বিদ্বান ভারী সুন্দর একটি শ্লোক রচনা করেছেন, বলেছেন–

ধনানী ভূমৌ পশবস্য গোষ্ঠে
নারী গৃহদ্বারী জনা শ্মশানে
দেহ চিতায়াম্ পরলোক মার্গে
ধর্মানুগ গচ্ছতি জীবেকা–

পরলোক যাত্রার পথে মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি হাতিশালের হাতি ঘোড়াশালের ঘোড়া গোশালার গাভী– স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিই পড়ে থাকবে এই পৃথিবীর মাটিতে। প্রিয়তমা পত্নী গোবরছড়া দিয়ে গৃহদ্বার পর্যন্তই যাত্রা করাবে। আত্মীয়-পরিজন বড়জোর শ্মশানযাত্রী হবে। পঞ্চভৌতিক দেহটিকে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হবে আত্মার পরলোক যাত্রার আনুকূল্যে। এখন প্রশ্ন হল– তবে আত্মার সঙ্গে পরলোক যাত্রার সঙ্গী হবে কে? উত্তরে বলা হয়েছে– ধর্মানুগ গচ্ছতি জীবেকা– জন্মজন্মান্তরের অনুসৃত ধর্মকর্মই কেবল আত্মার সহযাত্রী হবে পরলোক যাত্রায়। দেহস্থিত ব্যক্তির ধর্মকর্মই আত্মার পরলোক যাত্রার মূল সংবাহক। আর দেহান্তে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুসারী পারলৌকিক ক্রিয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আত্মার অবিনাশিত্ব এবং জন্মান্তবাদে বিশ্বাসী হিন্দু মৃত ব্যক্তির জীবাত্মার মঙ্গলের জন্যেই শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে শ্রদ্ধাশীল। অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত শ্রাদ্ধতর্পণাদির এই শাস্ত্রীয় বিধান যথাসাধ্য পালনীয়। শ্রাদ্ধকর্ম দ্বারা যে শুধু পিতৃপুরুষেরই উদ্ধার হয় তাই নয় শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিও তরে যায় যথার্থ ধর্ম-কর্ম অনুসরণপূর্বক আত্মার পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে। ❑

পুরুষোত্তমধামের কিছু উৎসব

সুব্রত দাসগুপ্ত

পুরীর কথা মনে হলে মনের মধ্যে ভেসে উঠে কিছু নাম– শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, জগন্নাথধাম, পুরুষোত্তমধাম, সেইসঙ্গে মহাপ্রসাদ ও রথযাত্রা। স্মরণাতীত কাল থেকে এই ধামে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছোট বড় উৎসবে মুখোরিত থাকে। প্রাচীনকালে বারো মাসে বারোটি উৎসব পালিত হলেও কালের বিবর্তনে বিভিন্ন রাজাদের ও অগণিত জগন্নাথ ভক্তদের উৎসাহ উদ্দীপনায় বর্তমানে বছরে প্রায় ৬০-৬৫টি উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উৎসবের বিবরণ দিতে চাই।

স্নানযাত্রা : জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন বছরের অন্যতম একটি গরমের দিন। এই দিনেই অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে এই তিথি হলো জগন্নাথদেবের আবির্ভাব তিথি। আমরা জানি যে, প্রভু জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণ একজনই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি হলো ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি হলো জগন্নাথরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তর তিথি। জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর এই রূপকে বলা হয় মহাভাব প্রকাশ। এই রূপান্তর নিয়ে একটি কাহিনী আছে তা এখানে উল্লেখ করতে চাই না।

রথযাত্রার চারমাস পূর্বে বাসন্তী পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয় রথ তৈরির কাজ। উড়িষ্যার দশপালা জেলার রানাপুর জঙ্গল থেকে রথ তৈরির প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ শুরু হয়। রথ তৈরির কারিগরগণ বংশপরম্পরা এই কাজ প্রত্যেক বছর করে যাচ্ছেন কারণ একবার ব্যবহৃত রথ পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হয় না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন সূর্য উদয়ের পরপরই মূল মন্দির থেকে বিগ্রহসমূহ শোভাযাত্রাসহ মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত স্নানবেদিতে নেয়া হয়। স্নানবেদির উপর থাকে রাজকীয় রঙিন চাঁদুয়া। মন্দির থেকে একে একে প্রথমে বলরাম, সুদর্শনচক্র, সুভদ্রাদেবী ও সবশেষে জগন্নাথ বিগ্রহ বাহির করা হয়। বিগ্রহসমূহ বহন করে নেয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে প্রচুর শক্তিশালী সেবক যাদেরকে বলা হয় দইতা। দইতাগণ হলো শবরগোষ্ঠীর লোক যারা বংশপরম্পরা ধরে জগন্নাথের সেবা করে আসছে রাজা ইন্দ্রদুম্ন-এর সময় থেকে। বিগ্রহসমূহ স্নানবেদিতে নেয়ার পর দইতাগণ ১০৮টি সুবর্ণ কলসীতে অক্ষয়বট নিকটবর্তী সোনাকূপ (রাজা ইন্দ্রদুম্ন কর্তৃক খননকৃত জলের কূয়া) থেকে শীতল পবিত্র জলে চন্দনগন্ধযুক্ত করে বিগ্রহসমূহকে স্নান করান। এটা হলো অভিষেক।

সন্ধ্যার পর বিগ্রহসমূহকে পরানো হয় হাতির মুখোশ। এই অবস্থাকে বলা হয় জগন্নাথের হস্তিবেশ। বলা হয় থাকে যেকোনো এক সময়ে শিবনন্দন গণপতি গণেশ জগন্নাথ দর্শনে স্নানযাত্রার দিনে পুরী আসেন কিন্তু জগন্নাথকে তাঁর মতো দেখতে না পেয়ে দুঃখিত মনে পুরী থেকে চলে যাওয়ার জন্য রওনা দেন। প্রভু জগন্নাথ সকলের অন্তর্যামী তাই ভক্তের কষ্ট দেখে তিনি ব্রাহ্মণের বেশে গণপতিকে আবার জগন্নাথকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। গণপতি গণেশ সন্ধ্যার সময় এসে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে হস্তিবেশে দেখে সন্তুষ্ট মনে পুরী ত্যাগ করেন। এইভাবে জগন্নাথ তাঁর ভক্তদের মনোবাসনা পূরণ করেন। স্নানযাত্রার দিন বিগ্রহসমূহ মন্দিরের বাহিরে আনার ফলে ঐদিন সর্বধর্মের/জাতের লোকরা জগন্নাথকে দর্শন করতে পারে।

অনবসর : বলা হয়ে থাকে স্নানযাত্রার দিন প্রথমে ঠাণ্ডা জলে স্নান, সারাদিন চাঁদুয়ার নিচে গরমে অবস্থান, সন্ধ্যায় শীতল হাওয়া ইত্যাদি কারণে জগন্নাথসহ অন্যান্যরা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই পরবর্তী পক্ষকাল (১৫ দিন) তাঁরা মন্দিরে না গিয়ে অন্য একটি আরামপ্রদ কক্ষে বিশ্রাম নেন। এই সময় নির্দিষ্ট কিছু পাণ্ডা ছাড়া কেউ জগন্নাথ-এর দর্শন লাভ করতে পারে না। এই সময়কে বলা হয় অনবসর কাল। এই সময়ে রোগমুক্তির জন্য জগন্নাথকে তরল পথ্য নিবেদন করা হয়। তরল পথ্য হলো বিভিন্ন ধরনের ফলের রস, উড়িষ্যার জঙ্গল হতে সংগৃহীত গুল্মলতা ও শিকড়ের রস। এই সময় বিগ্রহসমূহে প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনঃ রঙ করা হয়। রথযাত্রার পূর্বদিন বিগ্রহসমূহ মূল মন্দিরের রত্নবেদিতে পুনঃস্থাপন করা হয়। নতুন রঙ করার ফলে বিগ্রহসমূহ আরো উজ্জ্বল দেখায়।

রথযাত্রা : আষাঢ় মাসের শুক্লপকেষর দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা হলো জগন্নাথধামের সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব। এই সময়ে পুরীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে।

রথযাত্রার প্রধান উপকরণ হলো ৩টি রথ। রথযাত্রার চারমাস পূর্বে বাসন্তী পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয় রথ তৈরির কাজ। উড়িষ্যার দশপালা জেলার রানাপুর জঙ্গল থেকে রথ তৈরির প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ শুরু হয়। রথ তৈরির কারিগরগণ বংশপরম্পরা এই কাজ প্রত্যেক বছর করে যাচ্ছেন কারণ একবার ব্যবহৃত রথ পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হয় না। রথ তৈরির মূল কাজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের সম্মুখে গ্র্যাণ্ডরোডে শুরু হয়।

১৬ চাকাবিশিষ্ট ৫০ ফিট উচ্চতার জগন্নাথদেবের রথের নাম হলো নন্দিঘোষ। প্রতিটি চাকায় থাকে ১৬টি স্পোক ও পতাকায় অঙ্কিত থাকে সাপমুখে গরুড়। সাদা রঙ-এর ৪টি ঘোড়ায় (কাঠের) চালিত রথের সারথি হলেন মাতালী, গরুড় হলেন রক্ষক আর দ্বাররক্ষক হলেন জয়া ও বিজয়া। এই রথ তৈরিতে ৮৩২টি কাঠের খণ্ড ব্যবহার

হয় এবং জোড় দেয়ার জন্য কোনো লোহার পেরেক ব্যবহার করা হয় না। রথের আচ্ছাদনের কাপড়ের রঙ হলো লাল হলুদ।

চৌদ্দ চাকাবিশিষ্ট ৪৭ ফিট উচ্চতার বলরামের রথের নাম হলো তালবিজয়। প্রতিটি চাকায় থাকে ১৪টি স্পোক ও পতাকায় শোভা পায় লাঙ্গল প্রতীক। এই রথের রক্ষক হলেন শীষনাগ, দ্বাররক্ষক হলেন নন্দি ও সুনন্দি। ৪টি কালো অশ্বের সারথি হলেন দারুক। রথ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ৭৬৩টি কাঠের খণ্ড এবং রথের আচ্ছাদনের রঙ হলো লাল-সবুজ।

সুভদ্রাদেবীর রথের নাম পদ্মবিজয় বা দেবদোলনা বা দেবীরথ। এই রথে ১২টি চাকার প্রত্যেকটিতে ১২টি স্পোক থাকে এবং পতাকায় শোভা পায় পদ্মফুল। রথের উচ্চতা ৪৩ ফিট। জয়দুর্গা হলেন রথের রক্ষক ও দ্বাররক্ষক হলেন গঙ্গা ও যমুনা। ৪টি কাঠবাদাম রঙ-এর অশ্বচালিত রথের সারথি হলেন অর্জুন। ৫৯৩টি কাঠের খণ্ড এই রথ তৈরিতে ব্যবহার হয়। এই রথে সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে থাকেন সুদর্শন। রথের আচ্ছাদনের কাপড়ের রঙ হলো লাল-কালো।

রথযাত্রার দিন সকালে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সম্মুখে মন্দির থেকে প্রথমে বলরাম তারপর একে একে সুদর্শন ও সুভদ্রাদেবীকে ও সবশেষে জগন্নাথদেবকে বাহিরে এনে তাঁদের নির্দিষ্ট রথে আরোহণ করানো হয়। এই কাজের জন্য অত্যন্ত বলশালী পাণ্ডাদের প্রয়োজন পড়ে।

চিরাপানহারা : প্রাচীন প্রথা অনুসারে বিগ্রহসমূহ রথে আরোহিত হওয়ার পর প্রাচীন রাজবংশের বর্তমান প্রধানকে হস্তিশোভাযাত্রাসহ আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি একটি পালকিতে করে রথসমূহের সম্মুখে এসে একটি স্বর্ণহাতলযুক্ত ঝাড়ু দ্বারা রথসমূহের সম্মুখের রাস্তা ঝাড়ু প্রদান করে একে একে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবের রথের উপর ফুল ও সুগন্ধি জল ছিটিয়ে দেয়ার পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ রথের দড়ি ধরে রথ টানা শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানটির নাম হলো চিরাপানহারা। এই অনুষ্ঠানটির মূল হলো যে রাজা হলেন প্রজাদের প্রধান কিন্তু প্রভু জগন্নাথ হলেন এই জগতের সবার প্রধান।

এই অনন্য অনুষ্ঠানের একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তখনকার পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৭-১৪৯৭)-এর সঙ্গে দক্ষিণ কলিঙ্গ-এর সুন্দরী রাজকন্যা পদ্মাবতীর বিয়ে স্থির হয়। বিয়ের পূর্ববছরে রথের সময় রাজকন্যার পিতা নরসীমদেবকে রথ দেখার আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি না এসে তার একজন প্রবীন আমত্যকে অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন। রথের দিন রাজা পুরুষোত্তম প্রথা অনুসারে যথারীতি রথের সম্মুখে ঝাড়ু প্রদান করেন।

এই ঝাড়ু প্রদানকে ঐ আমত্য ভক্তিভাবে না চিন্তা করে দক্ষিণ কলিঙ্গ রাজাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং পরামর্শ দেন যে, একজন ঝাড়ুদার রাজার কাছে রাজকন্যার বিবাহ না দেয়ার ফলে দক্ষিণ কলিঙ্গের রাজা তার কন্যাকে পুরুষোত্তমদেবের নিকট বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

এতে রাজা পুরুষোত্তম অপমানিত হয়ে দক্ষিণ কালিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরাজিত হন। ভগ্নহৃদয়ে রাজা যখন পুরী ফিরে আসছেন তখন রাস্তায় একটি গ্রামে জগন্নাথদেবের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত শৈকাচার্য্যর সঙ্গে দেখা হয়। সবকিছু শুনে তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে প্রভু জগন্নাথের অনুমোদন/আশীর্বাদ নিয়েছেন কি-না। তিনি বলেন যেহেতু আপনি প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই তাই এই বিপর্জয়। ভগ্নহৃদয় রাজা পুরীতে এসে জগন্নাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে সারারাত হত্যা দিয়ে মন্দিরে পড়ে রইলেন এবং প্রার্থনা জানালেন। অবশেষে শেষরাত্রে তিনি শুনতে পেলেন কেউ একজন বলছে সামান্য বিষয়ে রাজা এত উতলা কেন। রাজাকে বলা হলো পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধযাত্রার জন্য এবং তাঁর দুই ভাই যুদ্ধে রাজাকে সহায়তা দিবেন।

এই কথা প্রচার হওয়ার পর রাজ্যের হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দিল এবং রাজা পুনঃ যুদ্ধযাত্রা করলেন, যদিও মনে কিছু সন্দেহ রইল।

রাজা সৈন্যসামন্তসহ যুদ্ধ যাত্রা করে চিলিকা লেকের কাছে একটি গ্রামে আসলে ঐ গ্রামের এক মহিলা এসে রাজাকে বলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্বে একটি কালো ও একটি সাদা ঘোড়ায় চেপে দুইজন সুন্দর পাগড়ী মাথায় দেয়া সৈনিক তার নিকট থেকে দই খান কিন্তু দই-এর মূল্য পরিশোধের সময় বলেন যে তাদের কাছে নগদ কোনো অর্থ নেই। তার পরিবর্তে ১টি আংটি প্রদান করে বলেন যে, রাজা পুরুষোত্তম-এর কাছে এই আংটি দেখালে তিনি দই-এর মূল্য পরিশোধ করে দেবেন। রাজা এই আংটি দেখে চমকিত হন কারণ উক্ত আংটিটি জগন্নাথদেবের আংটি রত্নমুদ্রিকা। রাজা সঙ্গে সঙ্গে এই মহিলাকে দই-এর মূল্য বাবদ এই গ্রামটি মহিলাকে দান করেন মহিলার নাম অনুসারে মণিকা পাটনা। রাজা বুঝতে পারেন যে, প্রভু জগন্নাথ তাদের সঙ্গেই আছেন এবং রাজার মনোবল শতগুণ বেড়ে যায়। এরপর সহজেই রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বন্দি করে পুরীতে নিয়ে আসেন কিন্তু বিবাহ না করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজকন্যাকে দিয়ে বলেন এই কন্যাকে যেকোনো ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিবেন।

প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি রাজকন্যাকে গোপনে রাখেন। পরের বছর রথযাত্রার দিন রাজা পুরুষোত্তম চিরাপানহারা অনুষ্ঠান হওয়ার পর রাজকন্যাকে রাজার হস্তে প্রদান করে বলেন যে আপনি হলেন প্রকৃত ঝাড়ুদার এবং এই কন্যার উপযুক্ত পাত্র।

রাজার ঝাড়ু দেয়া অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রথমে বলরাম, তারপর সুভদ্রাদেবী ও সবশেষে জগন্নাথদেবের রশি ধরে ভক্তবৃন্দ টেনে গুণত্তিকা মন্দিরের দিকে যাত্রা করে। জগন্নাথ মন্দির থেকে গুণাত্তিকা মন্দিরের দূরত্ব ২ কি.মি. হলেও অজস্র ভক্ত এবং মাঝে মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য অনেক বছর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে গুণত্তিকা মন্দিরে পৌঁছুতে পারে না। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রথ চালানো বিধান না থাকায় ঐ রাস্তাতেই রাত্রিযাপন করে পরের দিন যাত্রা সমাপ্তি করা হয়।

গুণত্তিকা মন্দিরে ৭/৮ দিন অবস্থান করে দশমীর দিন পুনরায় শোভাযাত্রা সহকারে বিগ্রহসমূহ মূল মন্দিরে এনে রত্নবেদিতে বসানো হয়। ❑

শারদীয়া অভিনন্দন
FISHCO
AHA!
উৎসবের দিনগুলোয় ভরে থাক দেশের স্বাদ।
নিমেষেই দেশের স্বাদ!

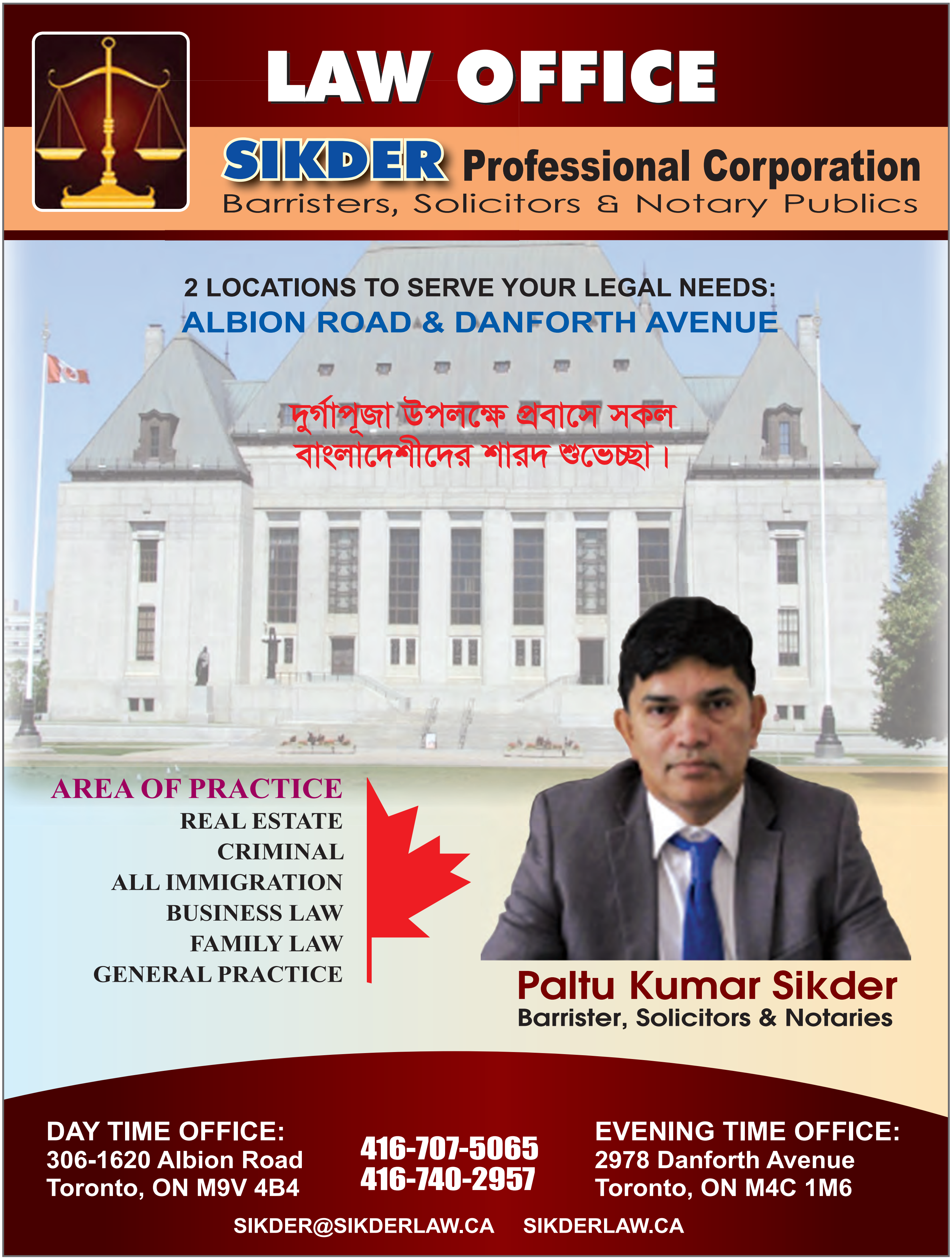
LAW OFFICE
SIKDER Professional Corporation
Barristers, Solicitors & Notary Publics
2 LOCATIONS TO SERVE YOUR LEGAL NEEDS:
ALBION ROAD & DANFORTH AVENUE
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রবাসে সকল
বাংলাদেশীদের শারদ শুভেচ্ছা।
AREA OF PRACTICE
REAL ESTATE
CRIMINAL
ALL IMMIGRATION
BUSINESS LAW
FAMILY LAW
GENERAL PRACTICE
Paltu Kumar Sikder
Barrister, Solicitors & Notaries
DAY TIME OFFICE:
306-1620 Albion Road
Toronto, ON M9V 4B4
416-707-5065
416-740-2957
EVENING TIME OFFICE:
2978 Danforth Avenue
Toronto, ON M4C 1M6
SIKDER@SIKDERLAW.CA
SIKDERLAW.CA

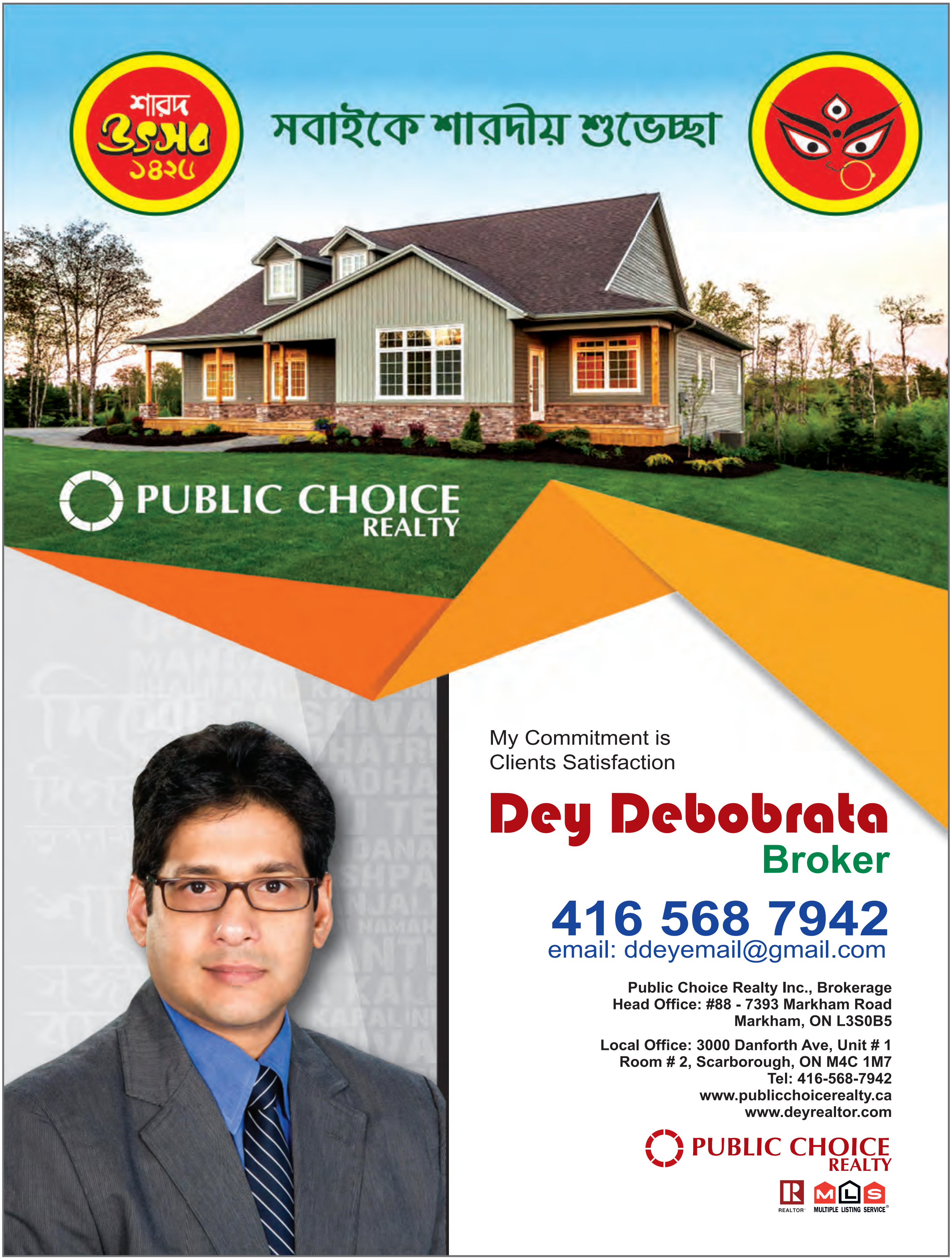
শারদ
উৎসব
১৪২৬
সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা
PUBLIC CHOICE
REALTY
My Commitment is
Clients Satisfaction
Dey Debobrata
Broker
416 568 7942
email: ddeyemail@gmail.com
Public Choice Realty Inc., Brokerage
Head Office: #88 - 7393 Markham Road
Markham, ON L3S0B5
Local Office: 3000 Danforth Ave, Unit # 1
Room # 2, Scarborough, ON M4C 1M7
Tel: 416-568-7942
www.publicchoicerealty.ca
www.deyrealtor.com
PUBLIC CHOICE
REALTY
REALTOR
MULTIPLE LISTING SERVICE

She
শারদীয় শুভেচ্ছা
next fashion Inc.
শী নেক্সট ফ্যাশন
We have exclusive collection of sarees, salwar kameez and kids fashion
Style
Heritage
Elegance
Fixed Price
বাংলাদেশ এবং ভারতীয় শাড়ী ও থ্রী-পিস এর বিশাল সম্ভার
Best Price Guaranteed
SIBLEY AVE.
She
VICTORIA PARK AVE
DAWES ROAD
DANFORTH AVE.
2960 Danforth Ave
Toronto, ON, M4C 1M6.
416 546 3130
You Tube
shenextfashion@gmail.com
www.shenextfashion.com
www.facebook.com/shenextfashion/
OUR SPECIALITY:
ঢাকার মসলিন, বেনারসী সিল্ক, গাদোয়াল, কাঞ্চিভরম, মঙ্গলগিরি, পচমপল্লীসহ বাংলাদেশী ও ভারতীয় বিভিন্ন রকমের শাড়ি। আরও রয়েছে ঃ লেহেঙ্গা, এক্সক্লুসিভ থ্রি পিস, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, Kids Fashion and Jewellery
একমাত্র পরিবেশক
রঙ
বাংলাদেশ
RANG BANGLADESH